ম্যান্ড্রেলা শিরিজ
অরণ্যরাজ্যে মান্ড্রেলা ১–৪
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ

বৈদ্যুতিন প্রকাশক

https://kheladhulo.blogspot.com

পরিকল্পনা -সুজিত কুন্ডু ০ রূপায়ন -স্নেহময় বিশ্বাস

অরণ্য রাজ্যে ম্যান্ডেলা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম ভাঙতেই ম্যান্ডেলা দেখল একটা চিতাবাঘ তার সামনে বসে। হাই তুলছে। ম্যান্ডেলা পিটপিট করে তাকাল। ভারি রাগ হচ্ছে। বেয়াদপ মনে হচ্ছে বাঘটাকে। ঘুম ভাঙলে সবারই হাই ওঠে। এতে লজ্জার কী আছে! তারও হাই উঠেছে।

বাঘটা এত পাজি! তার হাই উঠেছে দেখে বাঘটাও হাই তুলছে! তাকে ভ্যাংচাচ্ছে!

আর আশ্চর্য, বাঘটা তাকে লক্ষ্যই করছে না। চারপাশে গভীর বন, দূরে পাহাড়ের টিলা, সেখানে কুঁড়েঘর, কালো মানুষ–মাটির দাওয়া, মাটির দেয়ালে জীবজন্তুর ছবি আঁকা। সে এখানে কোনদিকে গেলে শহর, জানে না। সমুদ্রের ধারে ধারে সে কবে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার নিখোঁজ বাবাকে। সে উড়ে এসেছে। তার মাথায় জাদুকরের পালকের টুপি। সংগে হাইতিতি, রুপোর ঘণ্টা গলায়। রাতটা সে ঘাসের উপর শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। বাঘটার গায়ে কী বোটকা গন্ধ!

তার রাগ হচ্ছিল। সরে বসতে বলতে পারছে না। শত হলেও বাঘ! তার আবার হাই উঠল।

ওমা এ কী, বাঘটারও আবার হাই উঠছে!

তাকে তো দেখতে পাবার কথা না। সে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিয়ে দেখল, পালকের টুপিটা ঠিক আছে কিনা। পালকের টুপি মাথায় থাকলে তাকে কেউ দেখতে পায় না। পালকের টুপির এমনি গুণ! এখন সবচেয়ে যেটা বড় দরকার, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দেওয়া। ফলপাকুড় কী আছে এই গভীর বনে সে জানে না। তার তো খুশিমতো উড়ে যাবার কথা, বাতাসে ভেসে যাবার কথা! সে এখানে গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছিল কেন বুঝতে পারছে না। তখনই মনে পড়ল, চারপাশের পাখি প্রজাপতি ফুল দেখে জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছিল। বিশাল বিশাল বাওবাব গাছ–সে বই-এ ছবি দেখে, জায়গার নাম দেখে চোখ বুজে থাকে–এবং মা লুসি টেরও পায় না, কখন মেয়েটা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অবশ্য আর আগের মতো নিখোঁজ হলে, বুচার মামাকে ফোন করে জানায় না মা – বরং মামা রাগ করে বলে, ইদানিং চেপেই যায়, মামা মাঝে মাঝে খোঁজ নেয় ফোনে, তখন মা'র এক কথা, আছে, বাড়িতেই আছে।

তার একমাত্র সংগী ক্যাংগারুর বাচ্চাটা। জাদুকর কী ভাল মানুষ! সে একা কোথাও বাবাকে খুঁজতে যেতে পারে না। ভয় পেতেই পারে। ক্যাংগারুর বাচ্চাটাকে রুপোর ঘণ্টা না দিলে কী যে হতো! কিন্তু নচ্ছারটা গেল কোথায়! আরও খারাপ

লাগছিল, সকালে ঘুম থেকে উঠে কোথায় হাইতিতির মুখ দেখবে, তা না, একটা বিশাল বাঘ তার সামনে বসে থাবা চাটছে।

দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। সে বাঘটার গায়ে গোপনে চিমটি কেটে দিল। বাঘ কী মানুষের গন্ধ টের পায়!

বাঘটা দু-বার লেজ এদিক ওদিক নেড়ে ফের শক্ত হয়ে যেন বসল।

ম্যান্ডেলার দুষ্টু বুদ্ধি প্রখর। তাকে দেখতে পাচ্ছে না—কেবল তার শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, এই গভীর জঙ্গলে মানুষের গন্ধ পাওয়া কী বিপজ্জনক—তীর এসে গায়ে বিঁধতে পারে—ভয় পাবারই কথা। কারণ সে কাল পাহাড়ের টিলায় ঘুরে বেড়িয়েছে। একদল আধা-ন্যাংটা মানুষ, ভাল্লুক মেরে এনেছিল। কচি বাচ্চা সব, কালো কষ্টিপাথরের রঙ গায়ে, চুল কোঁকড়া, নাক থ্যাবড়া বাচ্চাগুলি শিকার করা জন্তুটার পাশে নাচছিল।

এটা যে একটা বুনো দেশ সে টের পায়—বই-এর পাতায় জায়গাটার নাম লেখা আছে বাসেন্ডা। কী বিদকুটে নাম! পর্তুগীজরা কবে যেন রাজত্ব করে গেছে—তারপর থেকে কালো মানুষদেরই দেশ হয়ে গেছে। বড় জঙ্গল আছে—মাইলের পর মাইল লাল মাটি, নীল আকাশ, কখনও ধূসর প্রান্তর, কোথাও জিরাফ দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে। জিরাফের একটা বাচ্চাকে ধরে সে আদর করেছিল। মাঝে মাঝে দুটো একটা গ্রাম, গোলমতো মাটির ঘর, ছোট দরজা। মাথায় পালকপরা মানুষও দেখেছে। কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে সর্দার কোথায় যাচ্ছে—তাকে অনুসরণ করছে একদল জঙ্গলের মানুষ।

আসলে এই হয়েছে মুশকিল।

সে খুঁজতে বের হয় তার বাবাকে। আর গিয়ে দেখে বাবা তার সেখানে নেই। অদূরে ভাঙা জাহাজ নদীর চড়ায় কিংবা সমুদ্রের খাড়িতে ভেঙে পড়ে থাকে ঠিক, কিন্তু বাবাকে খুঁজে পায় না। বাবা না থাকলে মানুষের কিছু থাকে না। সে এবারও বাবার উপর অভিমান করে পাইন ফ্যাস্টিভ্যালে যায়নি। মামা বলেছে, চল আমার সঙ্গে। সে যায়নি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। বাবার সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে যাবে না বলেছে। মা আদর করে বলেছে, লক্ষ্মীসোনা, কাঁদে না। সবাই বাবার কথা ভুলে গেছে—যাও। কেবল সে ভুলতে পারে না। বাবা তার জন্য জাহাজে বেশিদিন থাকতে পারত না। আট-দশ মাস পরপর চলে আসত। কত কিছু নিয়ে আসত তার জন্য।

যেবারে বাবা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা নিয়ে এল, কী হৈচৈ বাড়িতে! মেয়ের জন্য কোনো নাবিক জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা নিয়ে আসে ভাবা যায় না! বাবা তাকে কত ভালবাসত, বাচ্চাটাকে নিয়ে না এলে কেউ টেরই পেত না। মামা ঠাট্টা করে বলত, আচ্ছা মেয়ে-পাগল মানুষ তুমি! মেয়ের আবদার রক্ষা করতে শেষে জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাই নিয়ে এলে!

তা ঠিক, বাবা সমুদ্রযাত্রার আগে ক'দিন খুব মনমরা হয়ে থাকত। সে বাবার কাছছাড়া হতো না। মাও কেমন যেন তখন জলে পড়ে যেত। তার দিকে তাকালেই বাবা বুঝতে পারত ঘরে বসে থাকলে চলবে না। যেতেই হবে সমুদ্রে।

কী চাই তোমার? বাবা বলত।

আমার চাই কদম ফুল।

আর কী চাই?

একটা টিউলিপ গাছ।

আর?

আর চাই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, হাতি চাই।

বাবা তার জন্য কলম্বো থেকে নিয়ে এসেছিল কাঠের হাতি।

বাবা তার জন্য ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল কদম ফুল।

বাবা তার জন্য নিয়ে এসেছিল মেলবোর্ন থেকে জ্যান্ত একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। বাবা আদর করে ডাকত হাইতিতি।

সেও ডাকে হাইতিতি।

এমন বাবা জাহাজডুবীতে নিখোঁজ হয়ে গেলে কে এমন আছে স্থির থাকতে পারে! সে যখন স্থির থাকতে পারে না, তখনই জাদুকরের দেওয়া পালকের টুপি পরে নেয়, হাইতিতির গলায় রুপোর ঘণ্টা বেঁধে নেয়। সে বই পড়ে দেশের নাম জেনে নেয়। তারপরই সে সেখানে চলে যেতে পারে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে কোনো তার ভয় থাকে না। কাছে কোথাও হাইতিতি নেই, একটা জ্যান্ত বাঘ, বনজঙ্গল, খড়ের জমি এবং সবুজ অরণ্য আর পাহাড়ের মাথায় টিলা, সেখানে ধোঁয়া উঠছে—সে ঘাবড়ে যাচ্ছে।

বাঘটাকে সে ফের চিমটি কাটল। সে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, আর রেগে গেলে বাঘের গায়ে চিমটি কেটে দেয়। বাঘটা তবু যদি নড়ে। দু-পাঁচবার লেজ নাড়ে—এদিক ওদিক তাকায়—এই যা।

এবারে বেশ জোরে চিমটি কাটায় বাঘটা দু-লাফ দিয়ে সরে বসল। খুঁজছে কাউকে। ম্যান্ডেলা মজা খুঁজে পেয়ে গেল। সে পালকের টুপি পরে বের হলে, এমন অনেক মজার হদিস পেয়ে যায়। বাঘটাকে ভাবল নাচাবে। বাঘটা কী কোনো শিকারের আশায় বসে আছে!

ম্যান্ডেলা আবার বাঘটার পেটে সুড়সুড়ি দিয়েই ছুটে পালিয়ে গেল। তাকে দেখতে না পাক, কিন্তু বাঘটা যদি লেজের বাড়ি মারে, কিংবা থাবা মারে হাওয়ায় তার গায়ে এসে লাগতেই পারে। সে বুঝল, কাছে যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। আবার ভাবল পিছন থেকে গিয়ে বাঘটার পিঠে চেপে বসলে কেমন হয়!

যেই ভাবা সেই কাজ।

পিঠে চেপে বসতেই কী বিশাল লাফ! পিঠের উপর কেউ বসে থাকলে চাপ পড়বেই। আবার যে বসে আছে তাকে যদি দেখা না যায়।

আসলে ম্যান্ডেলার রাগ যত বাঘটার উপর! হাইতিতি নেই কেন? সে জোরে ডাকল, হাইতিতি, হাইতিতি, গলার ঘণ্টা কি ছিটকে পড়েছে? বাঘটা দেখে ফেললে তো থাবা বসাতে পারে, মেরে ফেলতে পারে, খেয়ে ফেলতে পারে—কথাটা মনে হতেই সে আরও জোরে ডাকল, হাইতিতি!

বাঘের পিঠে ম্যান্ডেলা। বাঘটা পড়ি-মরি করে ছুটছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। খুব নিরাপদ নয়। গাছের ডালপালা কাঁটাঝোপে দু-এক জায়গায় কেটে গেল। রক্তপাত হচ্ছে—সে যে কী করে! বাতাসে ভেসে যাওয়া দরকার।

আর তখনই হাইতিতি হাজির।
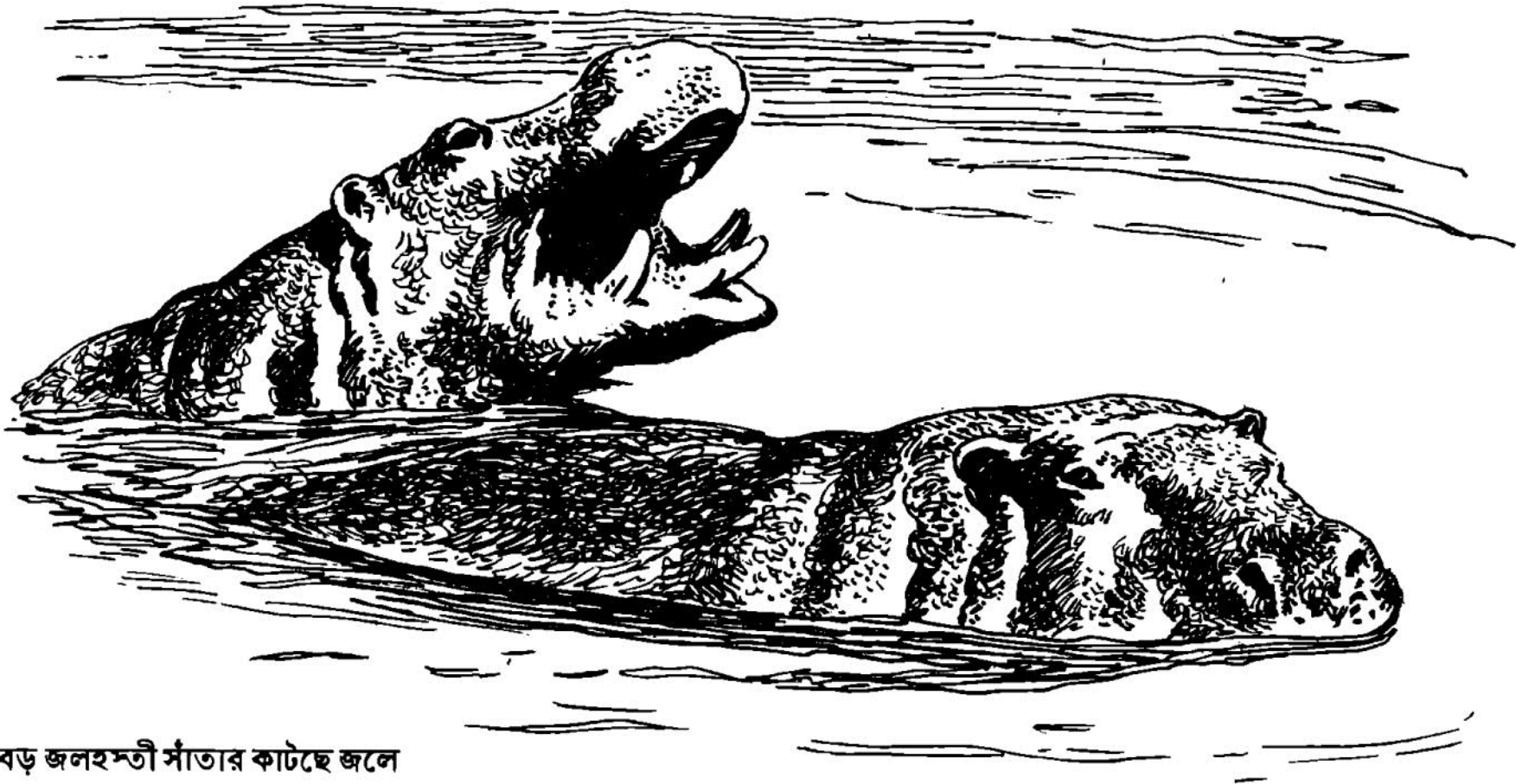
বড় বড় জলহস্তী সাঁতার কাটছে জলে

হাইতিতির ভাবভঙ্গি থেকে সে অনেক কিছু টের পায়। দুষ্টুটা একদন্ড বসে থাকতে পারে না। কেবল লাফায়। বাড়ি-ছাড়া হলে সাপের পাঁচ পা দেখতে পায়। বাড়িতে সারাক্ষণ বাঁধা থাকে। টিউলিপ ফুল চিবোয় আর ঝিমুনি। দেখলে তখন মায়া হয়। এখন এই যে হাইতিতির রুপোর ঘণ্টা বাতাসে ভেসে যাচ্ছে, তাতে অনেক দূরের পাখি প্রজাপতিরা পর্যন্ত সচকিত হয়ে গেছে। সে একটা জলার ধারে আশ্চর্য সব ইঁদুর ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। ইঁদুরগুলো উড়তে পারে। লোমওয়ালা ব্যাঙ দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে। পালকের টুপি পরে বের হলেই কত সব মজার জীবজন্তু দেখতে পায়। লোমওয়ালা ব্যাঙ সে দেখেছে বললেই মা তেড়ে আসবে। এমনিতেই তার প্রতিবেশীরা তাকে ভূতুড়ে মেয়ে বলে থাকে। তারা বিশ্বাসই করে না, জাদুকরের দেওয়া পালকের টুপি পরলে বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়, নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে গেলে সবারই যে চাই পালকের টুপি, তারা তা বোঝে না। মা তবু মনে করে, কিছু একটা সে পেয়েছে। এতবার সে বাড়ি থেকে দু-তিন দিন, একবার তো এক হপ্তা নিখোঁজ হয়েছিল—আগে মা কান্নাকাটি করত—এখন আর করে না।

মা হয়তো খুব বেশি হলে বলবে, ইঁদুরের পাখা আছে যে উড়বে?

সে যে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে! ইঁদুরের ঠিক পাখা নেই সে-ভাবে, তবে পায়ের পাতা থেঁতলানো, নরম হলুদ রঙের পায়ের পাতা মেলে দিলে উড়তেই পারে। কিন্তু এখন এ-সব ভাববার সময় তার নেই। হাইতিতি কিচকিচ করছে। কিছু তাকে বলতে চাইছে।

হাইতিতি তবে এতক্ষণ বাতাসে ভেসে গিয়ে আরও আশ্চর্য কিছু দেখে ফেলেছে।

সে আর কোনোদিকে তাকাল না। অনেক সময় বিপদের ঘ্রাণ পেলেও হাইতিতি চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে।

সে সব ফেলে হাইতিতির সঙ্গেই উড়ে গেলে একটা নদী দেখতে পেল। বড় বড় জলহস্তী সাঁতার কাটছে জলে। সব গা-গুলি কোনো না কোনো টিলার উপর। এক জায়গায় দেখল বড় বাওবাব গাছের নিচে একদল মেয়ে-পুরুষ নাচছে। আগুন জ্বলছে। তাতে শুয়োর, হরিণ, খরগোশ আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। কোনো উৎসব-টুৎসব হবে। একপাশে মেয়েরা, একপাশে ছেলেরা। গায়ে মুখে অজস্র উল্কি। বাঘ হরিণের ছবি আঁকা। প্রজাপতি ফড়িংও উল্কিতে আঁকা আছে। গলায় পাথর আর হাড়ের মালা। শরীর আগুনের আভায় চিকচিক করছে। চুলে উটপাখির পালক গোঁজা। ঢাকের বাজনা বাজছে দ্রিম দ্রিম। চারপাশে যেদিকে চোখ যায় শুধু ধু ধু প্রান্তর আর বড় বড় ঘাসের জঙ্গল।

বাতাসে ভেসে যাচ্ছিল হাইতিতি।

ম্যাণ্ডেলা ভেসে যাচ্ছিল। আশ্চর্য প্রসন্ন সকাল। সমুদ্রের দিকটা ঘুরে আসবে ভাবছিল। কিন্তু হাইতিতি তাকে ঠিক কিছু দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা যে কী ম্যাণ্ডেলা জানে না।

একবার সে এক বুড়োমানুষকে নির্জন দ্বীপে আবিষ্কার করেছিল। পাতার পোশাক গায়। লম্বা সাদা দাড়ি। দ্বীপটায় সে একাই থাকত। যুদ্ধ-পলাতক লোক। লোকটা জানতই না, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। লোকটার মেয়ের নাম রুমি। গাঁয়ের নাম ওবেরাও। গাছের কান্ডে সে লিখে রেখেছিল। ম্যাণ্ডেলা বুঝতে পেরেছিল, বুড়োমানুষটা মরে গেলেও গাছের কান্ডে তার মেয়ের নাম, গাঁয়ের নাম, নদীর নাম লেখা থাকবে।

বুড়োর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

সে সাদা জাহাজ পাঠিয়েছিল, বুড়োকে উদ্ধারের জন্য। কাপ্তান কিন্তু আর খুঁজেই পেল না তাকে। সে নিজেও ফের দ্বীপটায় উড়ে গেছে। দেখেছে সত্যি নেই। বুড়োমানুষটা গেল কোথায়! দ্বীপটা এতই ছোট যে ম্যাণ্ডেলা সহজেই ঝোপ-

জঙ্গলে উঁকি মেরে দেখতে পেরেছে। যে গাছটার ডালে বুড়ো পাতার ঘর বানিয়ে বসবাস করত, সেই ঘরটাও দেখেছে খুঁজে। না কোথাও নেই।

তারপর সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল একটা সাদা পাথর দেখে। ঠিক মানুষের মতো ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে যীশুর মতো। হাজার হাজার প্রজাপতি সেই পাথরের মূর্তির গায়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে কোনো ছোট গাছ। একটা মানুষ গাছ হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না।

এটা যে কালো মানুষের দেশ ম্যান্ডেলা ঘুরে ফিরে কিংবা উড়ে গিয়ে টের পেয়েছে। চিতাবাঘটা তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপরই এই কালো মানুষের নাচ, আগুন, মাংসপোড়া গন্ধ। একবার ইচ্ছে হলো ডাকে হাইতিতিকে। গাছের নিচে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে দেখার ইচ্ছা, এরা কেন আগুন জ্বেলে নাচছে। তাদের কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু সে জানে, বাতাসে ভেসে যাবার সময় হাইতিতির রুপোর ঘন্টা ডুং-ডাং বাজে। এদের ঢাকের বাজনা, কাড়া নাকাড়ার বাজনায় হাইতিতির ঘন্টার ডুং-ডাং শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শোনা গেলে কেউ গাছের নিচে থাকতে পারত না। ভয়ে ছুটে পালাত।

ভয়ে ছুটে পালাতেই পারে। তাদের শহরেও তো সেই প্রথম দিকে, জাদুকর রুপোর ঘন্টা দিয়ে যাবার পর হাইতিতিকে নিয়ে উড়ে গেলে, শহর ভেঙে সমুদ্রের ধারে লোক জমা হয়েছিল। সবার চোখ আকাশের দিকে। বুড়ো-বুড়ি, ছেলেছোকরা, জোয়ান মানুষ কেউ বাদ ছিল না। আকাশে ভূতুড়ে ঘন্টা কেন হাওয়ায় বাজে! তারপর যে করেই হোক জানাজানি হয়ে যায়, লুসির মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। লুসির মেয়েটা উড়ে যায় বাতাসে। নিখোঁজ হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। কেবল শিশুরা জানে, ম্যান্ডেলা প্রিয় ক্যাঙগারুর বাচ্চাটাকে নিয়ে তার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছে। এখন সে যখন ঘর থেকে জানালা দিয়ে বের হয়ে যায়, এবং শহর ছাড়িয়ে সমুদ্রের উপর ভেসে দূরদেশে রওনা হয়—তখন শীতের রাতে আগুনের পাশে বসে বুড়ো-বুড়িদের শুধু এক কথা—ভূতুড়ে মেয়েটা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ আকাশে আবার ঘন্টা বাজছে, ডুং-ডাং।

আর এই কালো মানুষের দেশে, ভূত-প্রেতের বিশ্বাস তো আরও বেশি। সে আর হাইতিতি বামুন্ডা পার হয়ে আসার সময়ই টের পেয়েছে, মাথার উপর ঘন্টার শব্দে গাঁয়ের মানুষ কেমন ত্রাসে পড়ে গেছে। আকাশে ঘন্টাধ্বনি—কে জানে কোন কেয়ামতের দিন হাজির, ঘন্টাধ্বনি শুনলেই ইঁদুরের মতো ছুটে পালাতে থাকে। হুই হাই—আকাশের দিকে হাত তুলে দেখায় আর মাঠ দিয়ে মানুষজন দৌড়ায়। তা দৌড়াতেই পারে। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, অথচ ঘন্টাধ্বনি, আকাশে-বাতাসে ঘন্টাধ্বনি, কোনো অলৌকিক ঘটনা ভাবলে ম্যান্ডেলার যে কী হাসি পায়! তায় এমন মজার জিনিস হাতে এসে যাবে, কখনও ভাবতেই পারেনি। ভাগ্যিস সে সমুদ্রের ধারে বসে একা একা গোপনে বাবার জন্য কাঁদছিল। না হলে জাদুকর বসন্তনিবাস জানতই না, ম্যান্ডেলার বাবা নিখোঁজ। বাবার জন্য কান্নাকাটি করলে কার না কষ্ট হয়। জাদুকর তার মায়ায় পড়ে গিয়েই পালকের টুপি আর রুপোর ঘন্টা দিয়ে গেছে।

—এই হাইতিতি!

হাইতিতি যেন বাতাসে সাঁতার কাটছে। ম্যান্ডেলা তাকে ডাকতেই অন্যমনস্ক। দাঁত খিচিয়ে বলল, কী!

—তোর খিদে পায় না!

তাই তো, খিদের কথা ভুলে গেছে তারা। আপাতত কিছু খাওয়া দরকার। কোথাও তেমন খাবারের বন্দোবস্ত নেই—কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খাওয়া খুব বিস্বাদ। এদিক ওদিক বাতাসে ভেসে গিয়ে নদীর ঢালুতে দেখল হাট বসেছে। আর যা হয়ে থাকে—হাট বসলেই দোকানপাট, জিলিপির দোকান, আনাজপাতির দোকান, মাংসের দোকান, ভিড়, হট্টগোল নিমেষে থমকে গেল। ছুটছে। কেউ ঝুড়ি ফেলে ছুটছে। কারো মুরগি উড়ে গেছে। কেউ ছুটতে ছুটতে পড়ে যাচ্ছে, আবার কেউ পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। এই বড় ঝঞ্ঝাট। জাদুকরের সঙ্গে দেখা হলে বলে নিতে হবে, দেখ রুপোর ঘন্টা সব সময় ডুং-ডাং বাজলে হয় না। এরা এত ভীতু মানুষ! ডুং-ডাং ঘন্টাধ্বনি শুনলেই দৌড়ায়।

অথচ ম্যান্ডেলা বই-এ পড়েছে, বার্ফুটের কালো গোঁসাইর কথা, ফনের কথা। এখানে বারুন্ডি নামে একটা ঠান্ডা আগ্নেয়গিরি আছে—যার মুখ হ্রদের মতো, হ্রদে জল প্রচুর, কুমির জলহস্তী গিজগিজ করে। বারুন্ডি দেখে যাওয়া দরকার। সে যেখানেই যায়—বিখ্যাত জায়গাগুলি দেখার শখ হয় তার।

আরও সব অদ্ভূত গল্প জেনেছে। বড় বড় মাছি উড়ে বেড়ায়। জামাকাপড়ে ডিম পেড়ে রাখে। সেই জামাকাপড় গায়ে দিলে ডিম চামড়ার নিচে বাসা বাঁধে। চামড়া ফেটে মাছির ডিম বের হয়ে আসে মাছি হয়ে।

এ-ধরনের মাছির উৎপাতে অবশ্য এখনও তাকে কিংবা হাইতিতিকে পড়তে হয়নি।

সে বই-এ আরও পড়েছে, বাসেন্ডার চারপাশে বনজঙ্গলে কিংবা বিশাল উপত্যকায় নানা উপজাতির বাস। এরা এক সময় নরমুন্ড শিকার করার প্রথায় বিশ্বাস করত। মানুষের মাংস পুড়িয়ে খেত। এমন কি পরিবারের কেউ মরে গেলেও তাকে ফেলে দেওয়া হতো না। তার মাংস পুড়িয়ে খাওয়া হতো। ভাবতেই ম্যান্ডেলার গা শিরশির করতে থাকে। অবশ্য এরা এখন সভ্য হয়েছে, মানুষের মাংস খাওয়ার অভ্যাস নেই। এইসব উপজাতিদের দলপতি রাজার সম্মান পেয়ে থাকে। এদেরকে এ-দেশের ভাষায় বলা হয় ফন। রাজ্যের সীমানা ছোট হলেও ক্ষমতা প্রতিপত্তি অশেষ এদের।

নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে—সে বই-এ পড়েছে। দলপতিকে বন্দী করতে পারলেই হয়। সেই কারণে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে ফনের প্রাসাদ। গরান গাছের খুঁটি দিয়ে তৈরি পাঁচিল—যাতে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা যায়, সে-জন্য প্রাসাদের চারপাশে গড় কাটা আছে।

ফনের প্রাসাদ পাহাড়ের উপর—প্রাসাদ না বলে অসংখ্য মাটির ঘর বলাই ভাল। টিনের চাল। কারণ ফনের অনেকগুলি স্ত্রী, ত্রিশ-চল্লিশ, কারো পঞ্চাশ। যার যত বেশি সে তত বড় ফন। পাহাড়ের নিচে সমতল ভূমি। চাষ-আবাদ। ফনের স্ত্রী-রা চাষ-আবাদের কাজ করে। কোমরের কাছে সামান্য রুমাল ঝুলে থাকে। শরীরে আর কিছু নেই। ম্যান্ডেলার প্রথমে কী

লজ্জা লাগছিল! চোখ সয়ে গেলে সবই স্বাভাবিক—তার চোখে এখন আর এ-সব আটকায় না। সে গরিলাদের রাজ্যেও ঘুরে এসেছে। ওদের বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। সে কাছে যেতে সাহস পায়নি। গরিলারা আসছে টের পাওয়া যায় জঙ্গলের ডালপালা ভেঙে পড়ে আছে দেখলে। মনে হবে দেখলে, জঙ্গলে গাছই তাদের প্রকৃত শত্রু। কেন যে এরা গাছের ডাল মটমট করে ভেঙে দেয়—কিংবা ভেঙে আনন্দ পায় সে বোঝে না।

অবশ্য বিশাল অঞ্চল ঘুরে সে দেখেছে জনবসতি বড় কম।

নদীর ঢালুতে হাট, হাটে নেমে সে হেঁটে যাচ্ছে। একটা ঝুড়িতে কালো রঙের অচেনা ফল। আগে একটু চেখে দেখতে হয়। সব চেখেছে। সে আর হাইতিতি। দুজনই হাঁটছে। কালো মিষ্টি ফল—খেতে বেশ সুস্বাদু।

সে কোঁচড়ে কিছু ফল নিয়ে নিল। নিজে খাচ্ছে, হাইতিতিকে দিচ্ছে।

—বড় রাক্ষস তুই, ম্যাণ্ডেলা বলল। আস্তে খা। আরে গলায় আটকাবে!

কে শোনে কার কথা!

দুজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। হঠাৎ কেন যে হাইতিতি ওদিকটায় লাফিয়ে চলে গেল। এত দ্রুত দৌড়াতে পারে যে মাঝে মাঝে পলকে চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যখন ফিরে এল, একটা আস্ত আনারস মুখে তুলে নিয়ে এসেছে।

ম্যাণ্ডেলা জানে এটা তাকে খুশি করার জন্য। যখন তখন পলকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সে একদম পছন্দ করে না। বিজ্ঞজনের মতো ব্যবহার তখন আবার শুরু হলো! তুই কী রে! অচেনা জায়গা, হারিয়ে গেলে কী হবে! আর যাবি? বলে ম্যাণ্ডেলা কান মলে দিতেই কী রাগ হাইতিতির!

—আমাকে তুমি মারলে? কান মলে দিলে?

—মারব। নচ্ছার কোথাকার। ওফ্ কি গুমর! থাক শুয়ে থাক! দেখি তোকে কে নিয়ে যায়!

ম্যাণ্ডেলা হাইতিতিকে ফেলে হাঁটা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল হাইতিতি। ম্যাণ্ডেলা ছাড়া তার যে আর কেউ নেই!

আসলে এত খাবার চারপাশে ছড়ানো, ছিটানো—ম্যাণ্ডেলা বলল—জিলিপি খাবি! বলে ঝুড়ি তুলে নিয়ে গিয়ে ম্যাণ্ডেলা একটা গাছের নিচে বসল। মুচমুচে জিলিপি। সাদা ফ্রক গায়ে। ক'ফোঁটা রস গড়িয়ে পড়তেই বলল, ইস, হলো তো। জামাটায় দাগ লেগে গেল। মা বকবে।

তারপরই মনে হলো, হাইতিতি তাকে কোথাও নিয়ে যাবে বলে বাতাসে ভেসে যাচ্ছিল। রাস্তায় হাট পড়ে যাওয়ায় খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে নিল। চান করলে ভাল হতো। এত গরম! কোথাও আবার যদি নদী পাওয়া যায় কিংবা হ্রদ। ওরা একটা হ্রদের পাড়ে এসে নামল। ম্যাণ্ডেলা জামাপ্যাণ্ট খুলে চান করে নিল। বড় বড় পাথর পড়ে আছে, পাথরের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা কালো জল নেমে যাচ্ছে নিচে। বড় বেশি স্রোত। ভেসে গেলে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে কেউ জানে না।

পাড়ে হাইতিতি ম্যাণ্ডেলার প্যাণ্ট ফ্রক নিয়ে বসে আছে। একটা গাছের ডাল জলের কাছে, গাছের ডাল ধরে হ্রদের জলে কিছুক্ষণ ভেসে থাকল। আর তখনই মনে হলো জঙ্গল থেকে হা রে রে রে করে বর্শা, তীর-ধনুক হাতে এক দঙ্গল লোক তার দিকে ছুটে আসছে।

ইস, সে ভুলেই গিয়েছিল, পালকের টুপি মাথায় না থাকলে সে সত্যিকারের মানুষ হয়ে যায়। সবাই তাকে দেখতে পায়। এমন কী জঙ্গলে যদি সিংহ থাকে, তারাও দেখে ফেলবে। সে জল থেকে উঠে চোঁ দৌড়। বুনো মানুষগুলির শিকার মিলে গেছে—কিংবা এক পরীর মতো ছোট্ট সুন্দর মেয়ে হ্রদের জলে স্নান করতে পারে ভাবতেই পারে না। বিদেশী মানুষের তাঁবু মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যে তারা হয়তো দেখে থাকে। কোথা থেকে এরা আসে, কেন আসে, বুনো মানুষেরা তা ভাবতে পারে না। তাদেরই কেউ হবে। চুরি করে নিয়ে যেতে পারলে ফনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যাবে অনেক টাকায়। কী ধান্দা আছে, ম্যাণ্ডেলার মতো ছোট্ট মেয়ে বুঝবে কী করে! সে দৌড়ে এসে হাইতিতির কোল থেকে প্রথমেই পালকের টুপিটা টেনে নিয়ে মাথায় পরে ফেলল।

বুনো মানুষগুলি থমকে দাঁড়াল।

আরে গেল কোথায়!

প্রথমে বিস্ময় চোখে-মুখে! গলায় হাড়ের মালা। মাথায় পালক গোঁজা। কালো কুচকুচে শরীর। হাতে পুঁতির চুড়ি। কোমরে পালকের পোশাক। কেউ পরে আছে সজারুর কাঁটার ঝালর। নড়াচড়া করলে ঝমর ঝমর শব্দ হচ্ছে। আর এগুচ্ছে না।

ম্যাণ্ডেলা গালে হাত দিয়ে বসে আছে গাছের গুঁড়িতে। সে
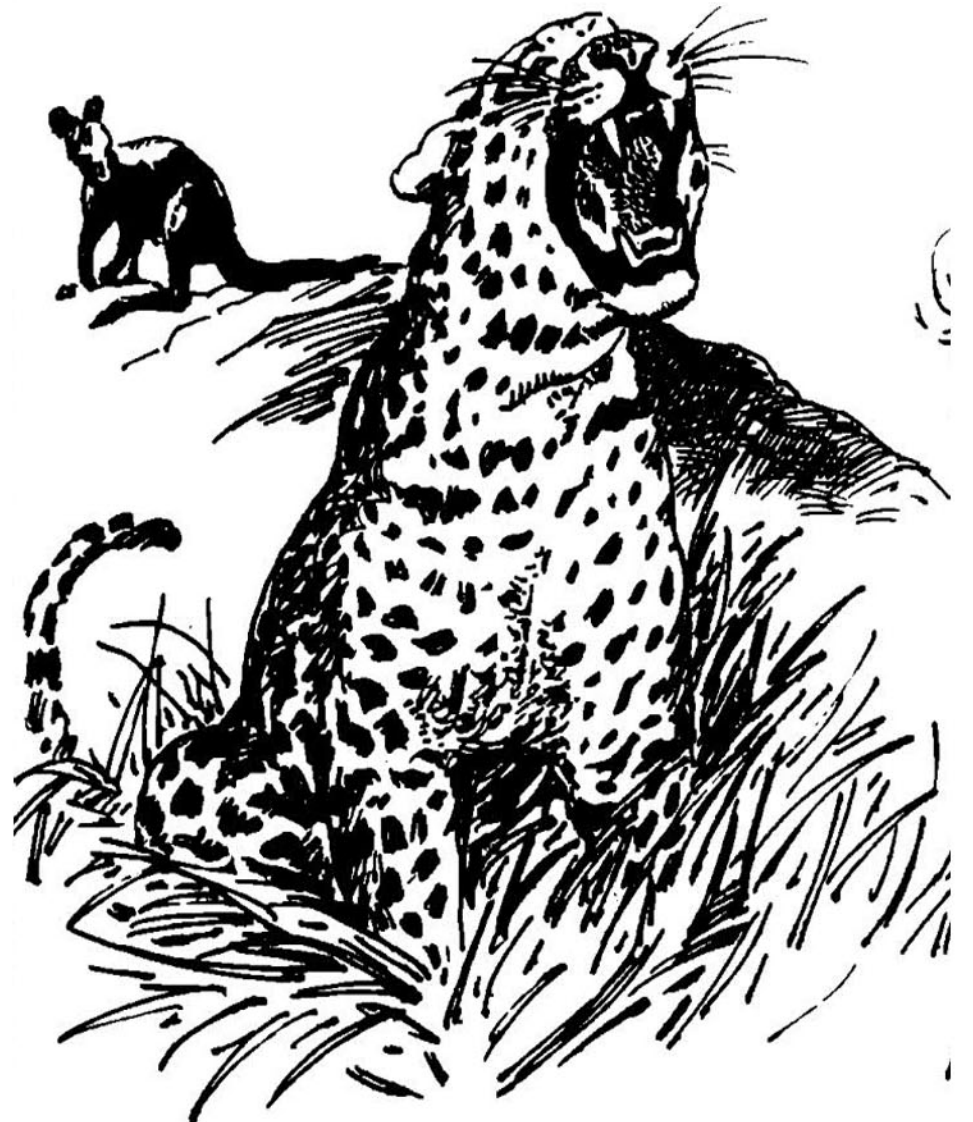
এখন কাউকে ভয় পায় না। হাইতিতি বাতাসে ভেসে গেলেই ডুং-ডাং ঘণ্টাধ্বনি উঠবে। পালাতে পথ পাবে না লোকগুলি।

ম্যান্ডেলা জানে, হাইতিতিটা ভারি দুষ্টু। মজা করার ইচ্ছে হলেই সে বাতাসে ভেসে যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছে নয়, বুনো মানুষগুলি পালিয়ে যাক। সে শুনেছে বুনো মানুষেরা বড় বেশি সরল হয়। এটা যে কোনো ভূতুড়ে কাণ্ড না হয়ে যায় না, তাদের চোখ-মুখ দেখেই তা টের পেয়েছে ম্যান্ডেলা। এক পা আর এগোচ্ছে না। সন্তর্পণে পিছিয়ে যাচ্ছে। কোন অপদেবতা কে জানে!

ম্যান্ডেলার হাসি পাচ্ছিল খুব!

তীক্ষ্ণ তীর হাতে। কারো হাতে বল্লম। কারো টাঙ্গি কাঁধে। শিকারে বের হয়েছে, দেখেই বোঝা যায়। তারা শিকারে বের হবার সময় ওঝা মন্ত্র পড়ে দেয়। সাপ কিংবা হিংস্র জন্তুকে তাদের ভয় নেই। এই সব হিংস্র জন্তুর পাশাপাশি তারা বড় হয়—বই-এ সে এমন পড়েছে। ভয় ভূত-প্রেত অপদেবতাকে। ওদের একটা জুজু হাউস থাকে। সব গাঁয়ে, ফনের প্রাসাদেও আলাদা জুজু হাউস। সেখানে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মারা আশ্রয় নেয়। শিকারে কিংবা যুদ্ধে যাবার আগে দিনরাত ঢাক বাজায় আর কালো শিঙ্গা বাজায়। নাচ-হল্লা, ওঝার মন্ত্রপাঠ আর আগুন। এইগুলি হলো তাদের দৈবজ্ঞান। এর চেয়ে বেশি কিছু তারা জানে না।

বুনো মানুষগুলি পিছু হটছে।

ম্যান্ডেলা ওদের মাথা গুলিয়ে দেবার জন্য পালকের টুপি খুলে ফেলতেই বুনো মানুষগুলি থমকে দাঁড়াল। ঐ তো গাছের নিচে! ছুটে আসছে তারা।

ম্যান্ডেলা ফের টুপি মাথায় দিলে লোকগুলির চক্ষু ছানাবড়া। এই আছে, এই নেই। নির্ঘাত কোনো দেবী। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটা সটান শুয়ে পড়ল। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

দেবী, আমরা অভাজন, রক্ষা করুন।

ম্যান্ডেলা হাসি চাপতে পারল না। তার খিলখিল হাসিতে আকাশ-বাতাস ভরে গেল।

বুনো মানুষগুলির মনে হচ্ছে, সামনের গাছগুলি হাসছে। আবার মনে হচ্ছে পাথরের আড়ালে বসে কেউ হাসছে। আবার মনে হচ্ছে আকাশ জুড়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।

হাইতিতি বলল, বসে থাকলে চলবে?

হাইতিতি মুখের কাছে সামনের দুটো পা জড় করে বলল, শীগগির চল!

হাইতিতির ভাষা একমাত্র সেই বোঝে। কিংবা তার কথা একমাত্র হাইতিতি বোঝে। না-হলে যেবারে লায়ন-রকে উড়ে গিয়েছিল, আর হাইতিতির টিউলিপ ফুল খেয়ে পেট ভার, সেবারে বুচার মামার কী রাগ! তখন সবেমাত্র পালকের টুপি পেয়েছে, রুপোর ঘণ্টা পেয়েছে। জাদুকর তাকে যা বলে গেল সত্যি কি-না দেখার জন্য প্রথমে বাড়ির চারপাশে, তারপর সামনের পাইন বনের মাথায় ভেসে গিয়েছিল। বেশি দূরে যেতে সাহস হয়নি। যদি হারিয়ে যায়! তারপর বাড়ি থেকে দূরে যে দ্বীপটা দেখা যায়, সেখানে সে উড়ে যেতে পারে কি-না ভেবে সঙ্গে নিয়েছিল হাইতিতিকে। বেচারা বাড়ি থেকে বের হতে পারলেই খুশি। তা ছাড়া সারা দ্বীপ টিউলিপ ফুলে ছেয়ে থাকবে কে জানত! হাইতিতিটা এত পেটুক, অখাদ্য কুখাদ্য যা পায় তাই খায়। আর টিউলিপ ফুল তো খেতে ভারি সুস্বাদু। হাইতিতি প্রাণভরে ফুল খেয়েছে। বাড়ি ফিরে এলে মামার বকুনি।

—কোথায় গিয়েছিলে! সকাল থেকে আমরা খুঁজছি। তোমার মা কান্নাকাটি করছে।

ম্যান্ডেলা বলেছিল, লায়ন-রকে।

শুনেই মামার কী রাগ! ঠাট্টা! এতটুকুন মেয়ে মামার সঙ্গে ঠাট্টা করছে! লায়ন-রকে কেউ যেতে পারে! রাফ-সিতে বোট চলে না। জুন-জুলাই-এর সমুদ্র ক্ষেপা মোষের মতো। এতটুকুন মেয়ে বলে কি-না লায়ন-রকে গেছে, এত সাহস!

মামাকে গম্ভীর দেখলেই ম্যান্ডেলা বুঝতে পারে বাবুর রাগ হয়েছে। ভাবছে, সে মিছে কথা বলেছে। সেও কেমন ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, এই হাইতিতি, আমরা লায়ন-রকে যাইনি? মামা বিশ্বাস করছে না। তুই আকণ্ঠ টিউলিপ ফুল খাসনি!

মামা বলেছিলেন, খুব বাড় বেড়েছ। চল ঘরে। চল বলছি। দরজায় শেকল তুলে দেব। বাইরে কী করে বের হও দেখব। কোথায় না কোথায় লুকিয়েছিলে, আর বলছ, লায়ন-রকে গেছ! তোমার কী পাখা গজিয়েছে, হ্যাঁ। দাঁড়াও বাঁদরামি বের করছি!

তার যে সত্যি পাখা গজিয়েছে বলতে পারেনি। পাখা না, পালকের টুপি। মাথায় দিলেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়, যেখানে খুশি যাওয়া যায় বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়। কিন্তু কী মুশকিল—জাদুকর বারবার সতর্ক করে দিয়েছে—কেউ যেন না জানে। জানলে টুপির জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। অগত্যা আর কী করে, হাইতিতির কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মামাকে। টিউলিপ ফুল কেবল লায়ন-রকেই ফোটে—আর কোথাও ফোটে না—অসময়ের টিউলিপ ফুল খেয়েছে হাইতিতি—দেখুক। সে হাইতিতিকে বলেছিল, মামা বিশ্বাস করছে না। মামা ভাবছে মিছে কথা বলছি। তুই ফুল খাসনি?

হাইতিতি সঙ্গে সঙ্গে ঢেকুর তুলে তাজা দুটো টিউলিপ ফুল জিভের ডগায় এনে দেখাতেই মামা তাজ্জব। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা শুধু ম্যান্ডেলার কথাই বোঝে না, জিভ বের করে টিউলিপ ফুলও দেখায়। মামা চিৎকার করে বলেছিলেন, লুসি, আমি পাগল হয়ে যাব! তোমার মেয়ে দেখ কী বলছে! আমার মাথা ঠিক রাখা কঠিন।

সেই থেকেই বুচার মামা টের পেয়েছিল হাইতিতি এত পোষা ক্যাঙ্গারু যে সে ম্যান্ডেলার ভাষা বোঝে। ম্যান্ডেলার কথাও হাইতিতি বোঝে।

শীগগির কোথায় যেতে হবে ম্যান্ডেলা জানে না। আসলে হাইতিতি কিছু দেখে এসেছে। ওর এই একটা কাজ—তার যেমন অনেকটা পথ ভেসে এলে, কিংবা ঘুরে বেড়ালে ক্লান্তি লাগে, হাইতিতির তা লাগে না। সকালে বের হয়ে কোথায় কী দেখেছিল, আর সেই থেকে জ্বালাচ্ছে। বুনো মানুষগুলিকে নিয়ে বেশ মজা করছিল, হাইতিতির জ্বালায় তাও মাটি।

এবার ফের দুজনেই উড়ে চলল।

ম্যান্ডেলার ইচ্ছে ছিল, রাত্রিটা গুন্ডারিকা জঙ্গলে গাছের মাথায় কাটাবে। সেখানে গরিলাদের এক একটা পরিবার একসঙ্গে থাকে। দু-এক দিন তাদের সঙ্গে বাস করার ইচ্ছে

আছে। কিন্তু আপাতত এত খেয়েছে যে উড়তে গিয়ে মনে হলো, গাছের ছায়ায় কোথাও একটু ঘুমিয়ে নিলে হতো। কিন্তু তা কী হবার জো আছে! হাইতিতির আর একটা দুষ্টু স্বভাব, সে সব খুলে বলে না। কেবল বলছে, খুব বিপদ।

—কার খুব বিপদ?

—আমি কী করে বুঝব কার! চলই না।

সেবারে দ্বীপে যে বুড়োমানুষটাকে আবিষ্কার করেছিল, তা বাবাকে খুঁজতে গিয়েই। হাইতিতি দেখার আগে সেই প্রথম দেখেছিল। পাহাড়ের মাথায় বসে একজন বুড়োমানুষ কোটা দিয়ে কী তুলে আনছে। তার এতই ভয় হয়েছিল, যে, যেভাবে ঝুঁকে তুলছে তাতে অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়ে গেলে মরবে। সে উড়ে গিয়ে পাখির খোঁদল থেকে বাসা তুলে বুড়োর কাছে এগিয়ে দিতে গেলেই চোঁ দৌড়। পাখির বাসা যদি বাতাসে ভেসে নাকের ডগায় ধাক্কা খায় কে না ভয় পাবে!

এই অঞ্চলটার নাম দুগান্ডা। এখানেও নানা উপজাতির বাস। বিশ-পঁচিশটা গ্রাম নিয়ে এক এক জন ফন রাজত্ব করছে। কিন্তু দুগান্ডা-ফনের বিশাল এলাকা—দশ-বিশটা গ্রাম নয়, অসংখ্য গ্রাম, গ্রামগুলি দূর দূর পাহাড়ের উপর। সামনে একটা ছোট্ট মরুভূমি—কিছু উটও দেখা গেল। কিন্তু হাইতিতি যাচ্ছে কোথায়! কার বিপদ! সে জানে বিপদ যারই হোক, তাকে রক্ষা করা কঠিন না। কারণ এ-দেশের মানুষগুলি ভূতের ভয়ে কাবু। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রসুন গোটার তেলের বাতি জ্বলছে বাড়ির দাওয়ায়। সেখানে কিছু শিশু খেলা করে বেড়াচ্ছে। একজন বুড়োলোক বাঁশের চোঙায় তামাক টানছে। কিন্তু খুব ব্যাজার মুখ। গাঁয়ে সোমত্ত নারী-পুরুষ কেউ নেই।

ওরা গোটা গ্রামটা ঘুরে দেখছে। কারো বাড়ির সামনে জবা ফুলের গাছ। ডাল দিয়ে বাড়ির দেয়াল, বুনো ঘাসের ছাউনি। হাঁস-মুরগির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বিশাল চালাঘরে কিছু ছাগল। গাঁয়ের মানুষজন কাছে-ভিতে নেই। এর আগে তারা এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ শুনেছে। দ্রিম দ্রিম। এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে সেই শব্দমালা পৌঁছে গেছে। কে জানে কী খবর! সে যে বুড়োমানুষটাকে বলবে, কী ব্যাপার, তুমি বুড়োমানুষ একা বসে শিশুদের আগলাচ্ছ—কী হয়েছে! আর মানুষজন গাঁয়ের কোথায়?

তাকে কথা বলতে হলে পালকের টুপি খুলে ফেলতে হবে। মুশকিল হলো, হাইতিতি এতটা উড়ে এসেও জায়গাটা ঠিক করতে পারছে না।

হাইতিতি কেবল বলছে, গুহা। পাহাড়ের গুহায় কাকে ফেলে দেওয়া হবে। আবার বলছে, আগুন। আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। বয়স বেশি না। দশ-বারো বছরের এক বালক। দশ-বারো বছর মানে ম্যাণ্ডেলার বয়সী ছেলেটা। পাহাড়ের গুহায় ফেলে দেওয়া হবে কেন, ফেলে দিলে কী হবে, সে-সব বোকাটা কিছুই জানে না। সে কেবল যেন দেখতে পাচ্ছে সেই বালককে পাহাড়ের মাথায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানেও নাচ-গান-হল্লা, বল্লমের নাচ, তীরের নাচ, হাতে টাঙ্গি নিয়ে নাচ চলছে। লোকগুলির মুখে নানারকমের চকখড়ি দিয়ে কিংবা লাল নীল রঙের বিচিত্র উল্কি আঁকা। কড়ির মালা পরেছে কেউ। হাইতিতি আর কিছু বলতে পারেনি।

বুড়োমানুষটা যদি কিছু খবর দিতে পারে!

ম্যাণ্ডেলা পালকের টুপিটা খুলে খুব সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল। একটা গাছের উপর বাতি জ্বলছে। মাটির গম্প। কেমন ভূতুড়ে পরিবেশ। বড় বড় গাছের ছায়ায় এক ধরনের নীরবতা রয়েছে। শিশুরা বুড়োলোকটাকে ঘিরে বসে আছে এখন।

সে বলল, এই বুড়োমানুষ, তোমার মন ব্যাজার কেন?

বুড়োমানুষটা আঁতকে উঠল। কী দেখছে! পরীর মতো ছোট্ট একটা ভিনদেশী মেয়ে। সোনালী চুল—সাদা ফ্রক গায়। কেউ সংগে নেই—একলা এই পাহাড়ের মাথায় উঠে এল কী করে! পাহাড়ের ঢালু অংশে চাষ-আবাদ হয়ে থাকে, আরও নিচে শুধু বুনো ঘাস কিংবা গভীর বন। হিংস্র জন্তুর বাস। হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়। যারা শিকারে যায়, কেউ কেউ আর ফেরে না। এমন অগম্য জায়গায় পরীর মতো সুন্দর মেয়েটাকে দেখে সে ঘাবড়ে গেল। বলল, আপনি কে মা-ঠাকরুন!

—আমি ম্যাণ্ডেলা।

—নিবাস?

—নিস্লাইমাউথ।

—এখানে?

—বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি।

—বাবা কে আপনার! আমাদের বুড়োবাবা থাকে গীর্জায়। তার তো কেউ নেই জানি। বুড়োবাবা বছরে একবার আসেন। লোকজন সংগে থাকে। বন্দুক থাকে, গোলা-বারুদ থাকে। গাঁয়ে এসে যীশুর পাঁচালি পাঠ করেন। তা আপনি মা-ঠাকরুন কী ভাবে এলেন! সংগে আর কে আছেন, একা তো কেউ আসতে পারে না মা-ঠাকরুন। দশ-বিশ ক্রোশ পার হয়ে আসতে হয় গাঁয়ে। বড়ই অগম্য জায়গা।

—বুড়োদাদু, বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। বাবা আসলে নাবিক। কী যে হলো! কতকাল হয়ে গেল! আচ্ছা বুড়োদাদু, তুমি কোনো জাহাজডুবীর খবর রাখ!

—না মা-ঠাকরুন! আমাদের দম্বা মহারাজ পালতোলা নৌকায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তিনি তো ফিরে এসেছিলেন। জাহাজভর্তি ধনরত্ন ছিল। তাঁর তো কোনো জাহাজডুবী হয়নি মা-ঠাকরুন।

মানুষটি বড় সরল। মুখ দুমড়ে মুচড়ে গেছে। নাম শুধু বলতে পারে। বয়স কত বলতে পারে না।

বললে এক কথা – এই পাঁচ সাত কুড়ি হবে। সে আঙুল গুনে কী হিসাব করে। তারপর পাঁচ আঙুল দশবার দেখায়।

এ-ভাবে বয়সের কোনো হিসাব বোঝা যায় না।

বুড়োদাদু বলল, তুমি একা মা-ঠাকরুন, কতটুকুন মেয়ে! তুমি জান মা-ঠাকরুন, আমাদের বড় খারাপ সময়। কেন মরতে এলে! কে তোমাকে নিয়ে এল! ভাল কাজ করেনি।

বুড়ো মাথা নাড়ছে, আর কেবল বলছে, ভাল কাজ করেনি। ভাল লাগছে না। মা-ঠাকরুন, বুঝতে পারছি না আপনি দেবী না মানুষ। চোখের উপর সহসা হাজির আপনি, এত দুর্গম পথ, বন্য জন্তুর উৎপাত, সংগে আপনার কিছু নেই, আত্মরক্ষার কোনো উপায় জানা নেই, কী করে এলেন! জানেন, ফনের কঠিন অসুখ। দশ-বারো বছরের বাচ্চা পেলেই জুজু হাউসে উৎসর্গ করা হচ্ছে। তারপর পাহাড়ের মাথায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বড়ই কঠিন সময়।

ম্যান্ডেলা অবাক—কখনও তাকে মানুষ ভাবছে, কখনও দেবী ভাবছে। দেবী ভাবলে, আপনি আজ্ঞে করছে, মানুষ ভাবলে তুমি বলছে।

—কী এমন দুঃসময় বুড়োদাদু!

—আমাদের ফনের কঠিন অসুখ। সুখিম্বা খুব বড় ওঝা। তাকে ফন দুজন স্ত্রীলোকসহ বহু ধনরত্ন দিয়ে আনিয়েছে। তল্লাটে সুখিম্বা নিদ্রা গেলে, কেউ তাকে জাগাতে সাহস পায় না।

—কেন, জাগিয়ে দিলে কী হয়?

—শস্যহানি হয়। মড়ক লাগে।

ম্যান্ডেলা শুনে অবাক! এ কেমন দেশ রে বাবা! ওঝাকে জাগিয়ে দিলে ফসল ফলে না। মড়ক লাগে।

সে বলল, লোকটা কোথায়?

—লোকটা বলছ কেন? ও আমাদের সুখিম্বা মহারাজ। বুড়োবাবা পর্যন্ত তাকে ঘাঁটায় না।

— বুড়োবাবা কে?

—ঐ যে যীশুর পাঁচালি পড়ে। বড় আকচা-আকচি দুজনে। আমরা সুখিম্বার কথা ছাড়া নড়ি না।

ম্যান্ডেলা বুঝতে পারে এই গভীর অরণ্যদেশে কোথাও কোনো গীর্জায় বুড়ো পাদ্রী থাকেন। এদের কুসংস্কারের অন্ত নেই। বুড়ো পাদ্রী এসে একরকম বোঝায়, সুখিম্বা এসে আর একরকম। আকচা-আকচি হবেই। কে পারে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে! সাহস কার এত!

—কিন্তু বুড়োদাদু, তুমি একা, আমার খুব খারাপ লাগছে।

—কী করব মা-ঠাকরুণ। বাচ্চাগুলিকে আগলে রেখেছি। সবাই গেছে ভাগু পাহাড়ে। মুম্বাটুকে আজ আগুনে দেওয়া হবে।

—আগুনে কেন?

—উৎসর্গ।

—মুম্বাটু কে?

—পিতৃপুরুষের দয়ায় মুম্বাটু আমাদের গাঁয়ে জন্মেছিল। ছ'-সাত বছরেই দামাল—সে কী দামাল ব্যাটা আমাদের — বাঁশের কঞ্চি দিয়ে খাঁচা বানাত, নদীর জলে পেতে মাছ ধরত। সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে যেত। ভয়ডর জানা নেই তার। সে তার বড়ভাই মুঙ্গার সঙ্গে জঙ্গলে শিকার করতে যেত। তার হাতে থাকত ধনুক আর কোমরে তীর। সঙ্গে শিকারী কুকুর। ইঁদুর-বাঁদর-খরগোশ সে সহজেই শিকার করতে পারত। হাতের নিশানা অব্যর্থ। কুকুরের গলায় ঘণ্টা বাঁধা। আট-দশ বছর বয়সেই সে একদিন একটা বাইসন শিকার করে ফেলল — হরিণ, চিতাবাঘ সব। তার তীর ছুটত আগুনের মতো। একবার একটা চিতাবাঘ ওর পিঠ থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছিল। সে দমেনি। শিকারী বেড়ালের মতো ওৎ পেতে ছিল। চিতাবাঘটা মেরে তবে ফিরেছে। দুর্জয় সাহস। একটু থেমে শ্বাস নিল বুড়ো। তারপর বলল, যেদিন সে হরিণ কিংবা চিতাবাঘ শিকার করে ফিরত, বাবা তার গাঁয়ের লোকদের ভোজ দিত। আট-দশ বছরেই সে ওস্তাদ শিকারী হয়ে উঠেছিল। জানি না সে কী পাপ করেছে?

—পাপ! ম্যান্ডেলা একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে সেই বিস্ময় বালকের কথা শুনছে। তাকে আজ আগুনে দেওয়া হবে। বুড়োর মন ভাল নেই। তার বয়সী একটা ছেলে বনের গভীরে ঢুকে যায়, আর চিতা শিকার করে শুনেই কেমন টান ধরে গেল ম্যান্ডেলার।

—তাকে আগুনে দেওয়া হবে কেন? কিছু বলছ না কেন?

—আমি আর কিছু বলতে পারব না!

—বল বুড়োদাদু? ভাগু পাহাড় কোন দিকে?

—পশ্চিমে যেতে হয়, তারপর দক্ষিণে হাঁটতে হয়, তারপর পূবে। সে পথ চিনে যেতে পারে একমাত্র ওঝা সুখিম্বা। সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গাঁয়ের পর গাঁ পড়বে। সে যে পথ দিয়ে যাবে, সবাইকে সঙ্গে যেতে হবে। মেয়ে-পুরুষ সবার হাতে তীর ধনুক বল্লম টাঙ্গি যার যা আছে তাই নিয়ে যেতে হবে। পরশু সকালে সবাই বের হয়ে গেছে। দু-দিনের পথ। হিংস্র জীবজন্তু পড়বে, এ-জন্য আগুনের মশাল জেলে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা হেঁটে যাবে। মুম্বাটুর গলায় জবাফুলের মালা। আঁট চেহারার খোয়ারি সে আজ। মাথায় টুপি, কোমরে সজারু-কাঁটার বাহারি ঝালর। মুখে প্রেতাত্মার উল্কি। নাক লাল, গাল সাদা, লম্বা চকখড়ির দাগ সারা গায়ে। পাতার রস আর হলুদ তেল গায়ে মাখা। গলায় কড়ির মালা।

—মুম্বাটুর কী পাপ বল বুড়োদাদু?

— জানি না। আহা, সরল সোজা মানুষ। কেন যে সে ওঝার কোপে পড়ে গেল! বলেই বুড়োমানুষটা জিভে কামড় দিয়ে ফেলল। কোপ বলা ঠিক হয়নি। ওঝা নিজেই কাঁচাখেকো দেবতা। কখন টের পাবে, সে ওঝার নিন্দা করছে—তবেই শেষ।

বুড়োমানুষটা উঠে দাঁড়াল। তার কান্না পাচ্ছিল বোধ হয়। কী উঁচু লম্বা মানুষটা! তালগাছের মতো লাগে। কষ্টিপাথরের মতো কালো রঙ। হাঁটু পর্যন্ত পাতার পোশাক। বুড়ো মানুষটার মন এত বিষণ্ণ যে সে আর কোনো কথা বলতেই চাইছে না। উঠোন পার হয়ে একটা বড় জারুল গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়ে কী দেখার চেষ্টা করছে।

ম্যান্ডেলা যে এখানটায় কী ভাবে এল, যে কোনো কারণে বড় রহস্য—অথচ বুড়োমানুষটা সে-জন্য আর বিচলিত নয়। বড় সংকট এই অরণ্য রাজ্যে। ফন তার উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রাসাদে শুয়ে আছে। সব মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। পাঁচিলের আনাচে-কানাচে মশালের আলো। জুজু-হাউস কিংবা বলা যায় পূর্বপুরুষের আত্মারা যে-ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে তারা ফন রাজত্বের মঙ্গল অমঙ্গল আভাসে জানিয়ে দেয়—জড় হয়েছিল ফনের নিরাময়ের জন্য—প্রার্থনা করেছিল পূর্ব-পুরুষের আত্মাদের উদ্দেশে তখনই ওঝার সেই রণহুংকার—পেয়ে গেছি, সব মনে পড়ছে বুড়োমানুষটার। অরণ্য রাজ্যের সবাই সেদিন জুজু-হাউস অর্থাৎ তাদের মন্দিরের সামনে হাজির। কী দৈববাণী হবে কে জানে! আশঙ্কায় উত্তেজনায় সবাই অস্থির।

ম্যান্ডেলা বুড়োমানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, মুম্বাটু তোমার কে হয়?

—আমার নাতি। আমার বংশধর। বলে বুড়োমানুষটা তো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ম্যান্ডেলার যে কী হয়, কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না

পায়।

সে বলল, আচ্ছা বুড়োমানুষেরা কখনও কাঁদে? তুমি কি! মুম্বাটু আমার বন্ধু। আমি যাচ্ছি। বলেই নিমেষে সে টুপি পরতেই অদৃশ্য। বুড়োমানুষটা এমন তাজ্জব ঘটনা জীবনেও দেখেনি।

হঠাৎ বুড়োমানুষটার কী মনে হলো কে জানে! সে দৌড়াতে থাকল অন্ধকারে—যেন সে আকাশে সত্যি কিছু দেখতে পাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে এক পরীর সংগে আর কেউ। ডুং-ডাং ঘণ্টার শব্দ শুনেই সে দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, দোহাই জুজু বাবার, দোহাই পাগুন বাবার, তুমি যেই হও, আমার নাতিটাকে রক্ষা কর। আমি তোমার গোলাম বনে থাকব।

ধীরে ধীরে সেই ঘণ্টাধ্বনি বিলীন হয়ে গেলে বুড়োমানুষটা উঠে এল বাড়িতে। হাঁস-মুরগি খাঁচায় ভরল। বাচ্চা-কাচ্চাদের মোষের দুধ খেতে দিল। তারপর সে হরিণের চামড়া বিছিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ার আগে আগুন জ্বেলে দিল মশালে। আগুন জ্বালিয়ে না রাখলে, গুঁড়ি মেরে উঠে আসতে পারে বুনো খেঁকশেয়াল, চিতাবাঘ কিংবা কোনো অজগর সাপ। কখন যে কে বাঘের পেটে কিংবা সিংহের পেটে চলে যাবে কেউ জানে না। তারপর সে টাঙ্গিটা কাঁধে নিয়ে খালি বাড়িগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াল। মন্ত্র পড়ল—বাপ-ঠাকুরদা যে মন্ত্র পড়ে অরণ্য রাজ্যে তাদের বাঁচিয়ে রেখে গেছে সেই মন্ত্র।

ম্যাণ্ডেলা দেখল সামনের উপত্যকায় বেশ আলো জ্বলছে। সে গীর্জার চূড়ো দেখতে পেল। এমন একটা বুনোদের দেশে গীর্জা দেখে সে খুব অবাক হলো না। কারণ সে বুড়োমানুষটার কাছে বুড়োবাবার খবর পেয়েছে। তাহলে এখানেই সেই বুড়োবাবা থাকে। সে শুধু জেনে নেবে কিভাবে গেলে ভাগু পাহাড়ে যাওয়া যায়। কি কি দেখলে সে টের পাবে এটাই সেই পাহাড়। কারণ সে বুঝতে পারে না, একটা পাহাড়ের সংগে আর একটা পাহাড়ের তফাত কোথায়। সব পাহাড়ের মাথাই একরকমের। এবং পাহাড়ের মাথা কেটে সমতল করে দেওয়ার নিয়ম আছে বোধ হয়। হিংস্র জীবজন্তুরা পাহাড়ের মাথায় উঠতে পারে না। নিরাপদ জায়গা ভেবেই এ-ভাবে বুনোমানুষেরা বসবাসের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

এখন ম্যাণ্ডেলা খুবই দ্রুত নেমে যাচ্ছে গীর্জার মাঠে। দৌড়ে সে গীর্জার ভিতরে ছুটে গেল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। বেদীর উপর কাঠের ক্রস—আর কাঠের খোদাই করা যীশু—সে হাঁটু গেড়ে যীশুকে বলল, জান মুম্বাটুর খুব বিপদ। ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। আচ্ছা কেন মারা হবে?

কে যেন বলল, কোনো অন্তরাল থেকে,মুম্বাটুকে আগুনে উৎসর্গ করলে ফন নিরাময় হয়ে যাবে।

—কে বলেছে?

—ওঝা সুখিম্বা।

—মিছে কথা।

—এরা সুখিম্বাকে পিতৃপুরুষদের জীবন্ত আত্মা ভাবে।

—তুমি কে কথা বলছ?

—আমি এই কেউ আর কি!

—কোথায় তুমি? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! তুমি অবাক হচ্ছ না, কোথা থেকে আমি উড়ে এসেছি? আমাকে
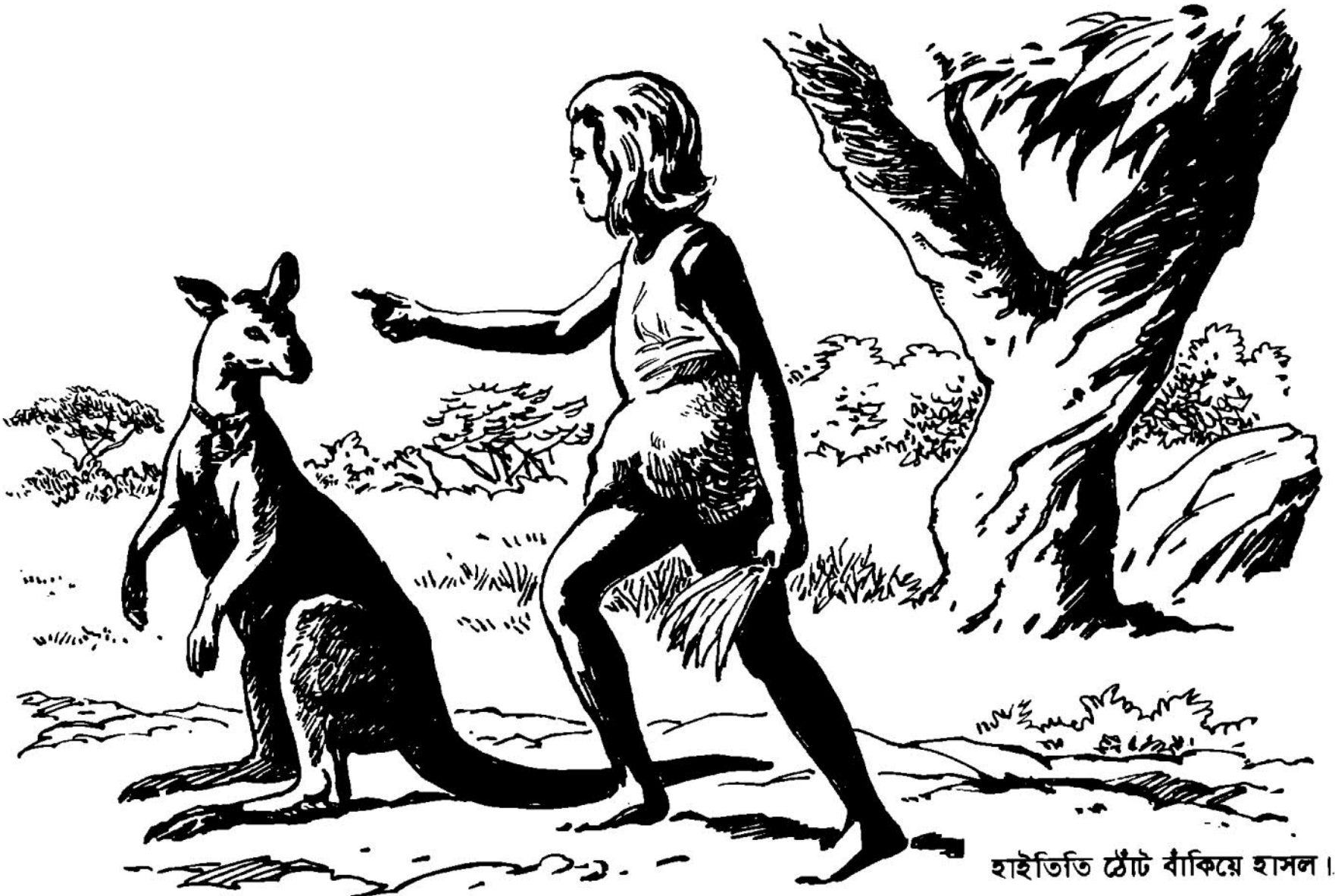
হাইতিতি ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল।

তুমি দেখতে পাচ্ছ?

–হ্যাঁ। পালকের টুপি পেয়েছ, জাদুকর বসন্তনিবাস তোমাকে দিয়েছে।

আরে বলে কী! এত সব জানে! সে চিৎকার করে উঠল, বল, মুম্বাটুকে আগুনে দেওয়া হচ্ছে কেন। তুমি এত জান, এটা জান না–এমন সুন্দর ছেলেটাকে পুড়িয়ে মারা হবে–তোমার কী মায়াদয়া নেই! তুমি তাকে রক্ষা করতে পার না?

–ফনের প্রভুত্বকে খাটো করলে সে খুন করবে। ওঝা সুখিম্বার আলখাল্লায় জোনাকি পোকা জ্বলে। গাঁয়ের সর্দারদের পরনেও আলখাল্লা। দেখে টের পাবে না কে সুখিম্বা আর কে গাঁয়ের সর্দার। সবার মুখই আজ চক্রাবক্রা রঙে বহুরূপী। আলখাল্লায় জোনাকি জ্বললে সে সুখিম্বা। সারারাত ধরে পুজো-আর্চা হবে। হরিণের মাংস পুড়িয়ে ভোজ। তারপর আগুন জ্বালানো হবে। চেরিকাঠের আগুন। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি ফেলে দেওয়া হবে। তারপর সেই আগুন যখন আংরা হবে তার উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে মুম্বাটুকে।

–তুমি কে, কে তুমি।

–আমি জাদুকর বসন্তনিবাস।

–বসন্তনিবাস, তুমি বেঁচে আছ! তোমার যে একটা মূর্তি সমুদ্রে ভেসে এসেছিল। বেলাভূমিতে পড়েছিল। সেদিন রাতে যে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখেছি, তুমি জলে ডুবে যাচ্ছ। জলে ডুবে পাথর হয়ে যাচ্ছ। মার্বেল পাথরের রাজপুত্র–পায়ে নাগরাই জুতো, মাথায় রেশমের পাগড়ি, চোখ দুটো বেথুন ফলের মতো। তুমি কি জান, বাবাকে এখনও খুঁজে পাইনি! আমার বাবা কোথায়? বল, বল, আমার বাবা কোথায়?

অবাক, আর কেউ কথা বলছে না।

–হাইতিতি, হাইতিতি, সে পাগলের মতো বাইরে বের হয়ে বলল, গীর্জার ভেতরে জাদুকর আমার সঙ্গে কথা বলল!

হাইতিতি ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল।

–তুই হাসছিস! বাবার কথা বলতেই চুপ মেরে গেছে। সাড়া দিচ্ছে না।

আসলে কী জাদুকর চায় তার বাবাকে খোঁজার চেয়ে বেশি দরকার মুম্বাটুর প্রাণ বাঁচানো! সে কী স্বার্থপর! স্বার্থপর হলে জাদুর পালকের গুণ কী নষ্ট হয়ে যায়? কত দিন পর জাদুকর তার সঙ্গে কথা বলল, কিন্তু বাবার কথা তুলতেই নীরব হয়ে গেল। সত্যি তো, বাবাকে তো সে সারাজীবন ধরেই খুঁজতে পারবে। কিন্তু মুম্বাটুকে যে বাঁচানো দরকার। জাদুকরের রাগ হতেই পারে।

ওঝা কিংবা উইচদের ক্ষমতা প্রবল, তারা বাতাসে ফুঁ দিয়ে পাথর উড়িয়ে দিতে পারে, হাতে তালি বাজিয়ে অরণ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে–তারা রক্তবাণ নিক্ষেপ করতে পারে, তারা অদৃশ্য আত্মাকে তীর মেরে নামিয়ে আনতে পারে, কারো আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে গেলে খপ করে ধরে ফেলতে পারে। দেশে অজন্মা হলে, মড়ক লাগলে ওঝা ছাড়া এই অরণ্য রাজ্যে আর কোনো উপায় নাই।

সে যখন উড়ে আসছিল, কোনো এক আলৌকিক উপায়ে কে যেন তার কানে কানে এ-সব খবর দিয়ে গেছে। বুড়োবাবা গীর্জায় নেই, পাশে ছোট্ট মাটির ঘর, দরজা বন্ধ। ঘুলঘুলি দিয়ে আলোর রেশ বের হচ্ছে।

ম্যান্ডেলা দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

–কে?

–আমি ম্যান্ডেলা।

হাইতিতির দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে সতর্ক করে দিল। একদম চুপ। একদম মাথা নাড়বে না। ডুং-ডাং ঘন্টা বাজলে কান মলে দেব। কে জানে, ভিতরে যে আছে সে ঘন্টাধ্বনি শুনলে যদি পালায়। তার এখন জানা দরকার কোন দিকে উড়ে গেলে ভাগু পাহাড় পাবে। সে অবশ্য উড়ে গিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে দেখতে পারে, কিন্তু আগুন না জ্বললে বুঝবে কী করে–তাছাড়া এই অরণ্য রাজ্যে রাত হলেই এমন অনেক পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলে–নাচ হয়। রেড়ির তেল গায়ে মেখে চকচকে করে রাখে শরীর–নারী-পুরুষ দল বেঁধে নাচে। আর হুলা হুলা হু হু এমন এক বিচিত্র সুর ভেসে যায় বাতাসে।

দরজা খুলে দিল যে, সেই বুড়োবাবা। একা, কেউ আর ঘরে নেই। তাকে দেখে বুড়োবাবা চোখ বুজে ফেলল, এতটুকুন একটা মেয়ে এত রাতে! ঘাবড়ে যাবারই কথা।

চারপাশে নিঝুম অরণ্য। মাঝে মাঝে হায়েনার ডাক শোনা যায়। কিংবা কর্কশ শব্দ পাখির। অথবা কোনো ময়াল সাপ যদি হরিণ গিলে ফেলে, তারও চিঁহি চিঁহি চিৎকার – কেউ সহজে আসতেই পারে না। এমন দুর্গম অঞ্চলে ছোট্ট পরীর মতো ম্যান্ডেলাকে দেখে বুড়োবাবা কোনো অলৌকিক ব্যাপার মনে করে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, আমি একজন ধর্মযাজক। যীশুর পাঁচালি পাঠ করি। আপনি কে?

সে বলল, আমি ম্যান্ডেলা। বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি।

বুড়োবাবা বলল, আপনার বাবা কী এখানে সিংহ চালান করার ব্যবসা করেন! তিনি কি কাফ্রিদের নিয়ে সিংহ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

সে বলল, না, না, তা হবে কেন? আমার বাবা নাবিক। জাহাজে কাজ করত। জাহাজডুবীতে বাবা নিখোঁজ। আমি বাতাসে ভেসে চলে যাই–যেখানে খুশি যেতে পারি।

কোনো অপদেবতা, কিংবা কোনো দেবদূতও হতে পারে। বালিকার বেশে তার সামনে হাজির। সে কেমন চোখ বড় বড় করে বলল, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?

–আরে না না! মুম্বাটুকে আগুনে পোড়ানো হবে। সুখিম্বা ওঝার আদেশ। মুম্বাটুকে আগুনে উৎসর্গ করলেই ফন ভাল হয়ে উঠবে! জুজু-হাউসে সুখিম্বা পূজা-আর্চা করে এই নিদান দিয়েছে।

– দেখুন আপনি এদের জানেন না। এরা এমনিতে খুব ভাল মানুষ। কিন্তু ওদের পূর্বপুরুষের যা রীতিনীতি তা থেকে এক পা নড়বে না। যীশুর পূজা ওরা করে ঠিক, তবে ওদের জুজু-হাউস থেকে ওঝা কিংবা উইচ যেই হোক, যদি কোনো আদেশ করে তবে মাথা পেতে নিতে হবে। মুম্বাটুকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সে পালিয়ে গেলেও রক্ষা পাবে না। কোনো গাঁয়ে তার জায়গা হবে না। খুঁজে পেলে তাকে বল্লমে খুঁচিয়ে মারা হবে।

–কেউ জায়গা দেবে না? কেন?

–কে দেবে! দিলেই যে অমঙ্গল–তাকে দেখলেও পাপ। সে

গাঁয়ে উঠে গেলে গাছের পাতা ঝরে যাবে, নদীর জল শুকিয়ে যাবে। শিশুরা সব পাথর হয়ে যাবে। অজন্মা হবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। আগুন জ্বলে উঠবে অরণ্য রাজ্যে। সুখিম্বার রক্তচক্ষু থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।

–বুড়োবাবা, আপনি একজন ধর্মযাজক, আপনি সব মেনে নিয়েছেন! এগুলো মিছে কথা, কখনও হয়। আপনি বিশ্বাস করেন।

–হতেও পারে। আমি যীশুর সেবা করি। এরা অনেকে যীশুর ভক্ত। দুটো স্কুলে এখান থেকে ছেলে পাঠাচ্ছি। মেয়েদেরও পাঠাচ্ছি। তারা যাচ্ছে। তারাই একদিন পারবে সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে কুসংস্কার দূর করতে!

–আচ্ছা বুড়োবাবা, এদেশে পুলিশ নেই? কাউকে খুন করলে সাজা হয় না?

–সাজা হয়! তবে এ তো পূর্বপুরুষের আত্মাকে খুশি করার জন্য। এটা এদের কাছে খুনের পর্যায়ে পড়ে না। পুলিশের ক্ষমতা নেই এমন দুর্গম অঞ্চলে আসে। রাজধানী ইয়াউন্ডেতে কেবল পুলিশ আছে। সেনাবাহিনীও আছে। তবে ফনদের জগতে কেউ ঢোকে না। এরা নিজ নিজ উপজাতির নেতা। ফনের বিরুদ্ধে কিছু করলে উপজাতিরাই বিদ্রোহ করবে।

–এ-দেশটার নাম কী ক্যামারুন!

–হ্যাঁ, ক্যামরুন। পর্তুগীজদের ভাষা এটা। ক্যামারুন মানে চিংড়ি মাছ। এখানকার সমুদ্রে প্রচুর চিংড়ি পাওয়া যায়। অনেক বছর আগে মসলার দ্বীপ খুঁজতে গিয়ে জায়গাটা আবিষ্কার করে। পর্তুগীজরা এদের ঘাঁটায় না। আর এই অরণ্য রাজ্যে কী হয় না হয় তারা মাথায়ও রাখে না। ওদের পয়সা হলেই হলো।

–ইস কী যে হবে?

বুড়ো ধর্মযাজক বললে, আপনি কোথা থেকে আবির্ভূতা হলেন, একটু যদি বলেন। আমি খুবই বিচলিত বোধ করছি।

ম্যান্ডেলা বলল, সে অনেক দূরের দেশ। সমুদ্র পার হয়ে যেতে হয়। নিপ্লাইমাউথে আমার মা আছে। আর আমাদের বাড়ির ঢালুতে পাইনের বন। তারপর সমুদ্র। উপত্যকায় আমাদের ছোট্ট কাঠের বাড়ি। লাল নীল রঙের। জান, আমাদের একটা সিলভার ওক গাছ আছে। আমার মা এখন আর ভাবে না। ঠিক আমি ফিরে যাব। আর খোঁজাখুঁজিও করে না। মাকে বলেছি, আমার কোনো বিপদ হবে না। জান, মা বিশ্বাস করে একদিন ঠিক বাবাকে আমি খুঁজে পাবই।

বুড়ো ধর্মযাজকের পা হাঁটু কাঁপছে। বোধ হয় ভিরমি খাবে। ঠিক তাই।

ম্যান্ডেলা দেখল বুড়ো ধর্মযাজক বিড়বিড় করে কী বলছে!

ইস, কী জ্বালা! এই হাইতিতি, শীগগির আয়। জল আন। দ্যাখ বুড়োবাবা ভিরমি খেয়েছে। আচ্ছা কী জ্বালা হলো বলতো। জল আন। ওদিকে মাটির কলসিতে জল আছে। আন। ভাঙবি না। থাক, তোকে দিয়ে যদি কিছু হয়।

ম্যান্ডেলা নিজেই কলসি থেকে গড়িয়ে এক গ্লাস জল নিল। জলের ঝাপটা দিল চোখে। দু-তিন বার জলের ঝাপটা দিতেই চোখ মেলে তাকাল বুড়োবাবা। সে তাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দিল পাতার বিছানায়। তারপর সে আর এক দন্ড দেরি করল না। দেরি করলে ভাগু পাহাড়ে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

তা ছাড়া বলতে পারে, তুমি কী করে দুটো সমুদ্র পার হয়ে এলে! সে তো বলতে পারে না, আমার পালকের টুপি আছে, হাইতিতির রুপোর ঘণ্টা আছে, চোখ বুজে বই-এ দেশটার কথা ভাবলেই পালকের টুপি সেখানে পৌঁছে দেয়।

আরে কী ভুল, কী ভুল! সে তো ভাগু পাহাড়ের কথা ভাবলেই জাদুকরের টুপি তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে। কেন যে মরতে সে বুড়োবাবার কাছে জানতে এসেছিল, ভাগু পাহাড় কোনদিকে?

সে বাইরে এসে দু-হাত ডানার মতো মেলে দিল। চোখ বুজে থাকল, বলল, আমাদের ভাগু পাহাড়ে নিয়ে চল।

ধর্মযাজক লরেন্স চোখ মেলে দেখল, কেউ নেই। দুঃস্বপ্ন। কিন্তু মুম্বাটুকে পুড়িয়ে মারা হবে, এ খবর তো সে পেয়েছে। তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে সে যাবে কী করে এতদূর! সে শহরে গিয়েও খবর দিতে পারবে না। বিশ-বাইশ দিন হেঁটে গেলে পাকা সড়কে ওঠা যায়। সুখিম্বার মতো কিছু মানুষ তাকেও যে ঈশ্বরের কাছাকাছি মানুষ ভাবে। তারও দৈবশক্তি আছে– আসলে এ-দেশে পীতজ্বরের খুবই প্রকোপ। সে এই পীতজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেছে। লতাগুল্মের মধ্যেই থাকে নানাপ্রকার মহৌষধির গুণ। যারাই নিরাময় হয়েছে তারাই ভেবেছে, মানুষটা সাক্ষাৎ দেবতা। কিংবা পূর্ব-পুরুষদের আত্মা তার মধ্যে ভর করেছে।

মুম্বাটুর জন্য তারও কষ্ট হয়। সে তাকে দেখেছে। কষ্টিপাথরের ছোট্ট যীশু যেন। সুখিম্বা কী টের পেয়েছে, এই ছোঁড়াটা বড় হয়ে তাকে ভাতে মারবে। এত বড় দস্যি ছেলে বাণ্টু উপজাতিদের ঘরে জন্মাতে কে কবে দেখেছে। কে জানে সেই-ই ফনের উত্তরাধিকার পেয়ে যায় কিনা। সুখিম্বা তালে আছে তার পুত্রকে গছাবার। সে যদি এ-ভাবে দৈব হুকুমের নামে মুম্বাটুকে শেষ করে ফনকে নিরাময় করে তুলতে পারে, তবে ফন তাকে যা চাইবে তাই দেবে। কারণ ফনের শেষ বয়সে একটি মাত্র কন্যা। তার এত স্ত্রী, অথচ কারো কোনো সন্তান নেই। উনত্রিশ নম্বরের স্ত্রীর একটি মাত্র কন্যা। মুম্বাটু যা চঞ্চল, আর যা তার দুর্জয় সাহস–তাতে ফন তাকে বেছে নিতেই পারে।

ধর্মযাজক লরেন্স এক গ্লাস জল খেল। পরীর মতো ছোট্ট মেয়ে তবে এখানে উড়ে এসেছে। এমন তাজ্জব ঘটনা সে অবিশ্বাসই বা করে কী করে! চোখের উপরই দেখল, দরজা খুলে দিতেই সাদা সিল্কের ফ্রক গায় ছোট্ট এক মেয়ে হাজির। তাকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা পর্যন্ত দিয়েছে। মুখ মুছে তার মনে হলো, কোথায় কী লীলা তাঁর কে জানে–সে মাঠ পার হয়ে যাবার সময় শুনল আকাশে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। সে নতজানু হয়ে বুকে ক্রস এঁকে দিল।

বাতাসে পোড়া মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে। ম্যান্ডেলা দেখছে গাছপালার ফাঁকে আগুনের আভা ফুটে বের হচ্ছে। ধোঁয়া আর সেই হুলা হুলা হু হু নাচ।

ম্যান্ডেলা দূর থেকেই হাইতিতিকে সতর্ক করে দিল–ঘণ্টা বাজাবি না। ঘাড় দোলাবি না। ঘণ্টা বাজলে কে জানে সুখিম্বা জেনে ফেলবে কিনা ম্যান্ডেলা এসে গেছে। ওঝারা অজস্র তুক-তাক জানে। সে যেমন বসন্তনিবাসের কাছে পালকের টুপি পেয়েছে, সুখিম্বাও পূর্বপুরুষের আত্মাদের কাছ থেকে দৈব-

শক্তি পেতে পারে। সে যদি জাদুকর বসন্তনিবাসের চেয়েও পরাক্রমশালী হয়! সে বাতাসে ভেসে যেতে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে— এ-ছাড়া পালকের টুপির তো আর কোনো গুণ নেই। যদি সুখিম্বা তুকতাক করে তার পালকের টুপির জাদু নষ্ট করে দেয়। দিতেই পারে—সবাই সুখিম্বাকে যমের মতো ভয় পায়। তাকে আগে দেখতে হবে, সে যে চুপি চুপি গাছের নিচে পালকের টুপি মাথায় নামাল, তা টের পায় কিনা। ওঝা সে। ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার। তাদের সে নিশ্চয়ই দেখতে পায়। তাকেও দেখে ফেলতে পারে। এ-সব চিন্তা মগজে কাজ করতেই ম্যান্ডেলা গম্ভীর হয়ে গেল।

অশরীরীদের নিয়ে কারবার। চাট্টিখানি কথা নয়। যদি পালকের গুণ তুকতাক করে নষ্ট করে দেয়, তবে সে আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। এই প্রথম একজন উইচ কিংবা ওঝা যাই বলা যাক না, তার সঙ্গে মোলাকাত হবে।

তার বুক কাঁপছিল।

হাইতিতির মোটা বুদ্ধি। জ্বালা এখন হাইতিতিকে নিয়ে। সে যদি অবুঝের মতো লাফালাফি শুরু করতে থাকে তবে নির্ঘাৎ গলার ঘণ্টা বেজে উঠবে। গলা থেকে ঘণ্টা খুলে নেওয়াও খুব বিপদ। সে তবে সত্যিকারের একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা হয়ে যাবে। তাকে দেখে ফেললে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে পারে।

ম্যান্ডেলা যত নিচে নেমে আসছে, সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইস, চোখে দেখা যায় না। দ্রিম দ্রিম ঢাক বাজছে গোটা দলের। ঢাকের উপর চিতাবাঘের চামড়ার ছাউনি। একপাশে আলখাল্লা পরা আট-দশজন লম্বা অতিকায় পুরুষ। মাথায় পাগড়ি। গলায় সেই কড়ির মালা। মুখে বিচিত্র রঙবেরঙের উল্কি। সুখিম্বা কোন লোকটা সে বুঝতে পারছে না। কারণ এদের কারো আলখাল্লায় জোনাকি জ্বলছে না।

বড় বড় কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। আগুনের চারপাশে সব নারী-পুরুষেরা নেচে চলেছে। মুম্বাটু কোথায়! তবে কি তাকে পুড়িয়ে ফেলেছে! বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। অগ্নিকুন্ড সারি সারি। তার উপর কাঠের ঠেকায় আস্ত হরিণ শূয়োর ছাগল রোস্ট করা হচ্ছে। গোল সবুজ পদ্মপাতায় মাংসের টুকরো কেটে ফেলা হচ্ছে। খুশিমতো তুলে নিয়ে যাচ্ছে যে যার মতো।

তাকে দেখতে পায় কিনা, এটা পরখ করার চেয়েও প্রথম কাজ মুম্বাটু কোথায়। একবার সে চিৎকার করে ডেকে ফেলেছিল আর কি?—মুম্বাটু, তুমি কোথায়! লোকজন গিজ-গিজ করছে। সে এদিক ওদিক ছুটছে। এবং দেখতে পেল মুম্বাটুকে। কারণ তার মুখ দেখেই বুঝল সে মুম্বাটু। ম্যান্ডেলা ভেবেছিল, মুম্বাটুকে দড়িদড়ায় বেঁধে রাখা হবে—কিন্তু তা না, আশ্চর্য, মুম্বাটু হেঁটে যাচ্ছে অগ্নিকুন্ডের কাছে। তার কোমরে সজারু-কাঁটার ঝালর। কী সুন্দর মিষ্টিমুখ! দেখে মনেই হচ্ছে না, তাকে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হবে। আর পাশে বিশাল বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে যেন কোনো প্রেতাত্মার নির্দেশে চলছে। তার মধ্যে প্রাণ আছে বোঝা যাচ্ছে না। চক্ষুস্থির। দু-হাত উপরে তুলে হাঁটছে। সে বোধহয় ফনের পূর্বপুরুষদের আত্মাকে আবাহান করছে। চোখ রক্তবর্ণ।

মুম্বাটু এক জায়গায় এসে বসে পড়ল। তার মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাক, মুম্বাটু বেঁচে আছে। এখন দেখা দরকার, কেউ টের পায় কিনা, সে এখানে আছে। পরখ করার প্রথম কায়দাটি পাশের একটি স্ত্রীলোকের উপর ব্যবহার করা যাক।

সে চিমটি কাটল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী হামহুম্বা করে লাফাতে থাকল।

লোকজন কী বলছে বুঝতে পারছে না। কিন্তু এত জোরে ম্যান্ডেলা চিমটি কেটেছে নখের দাগ বসে গেছে। হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। নিজেদের মধ্যেই মারা-মারি শুরু হয়ে যাবে বোধ হয়—কারণ ম্যান্ডেলা টের পেয়ে গেছে এই বুনো মানুষগুলির মধ্যে সে আছে কেউ বুঝতে পারছে না।

সহসা সেই বিশাল বপুয়ালা সুখিম্বার বজ্রকণ্ঠ। সব একেবারে পাথরের মূর্তি। নড়ছে না।

কী হবে এবার?

ম্যান্ডেলা বোবার মতো ভাবছে কী হবে এবার!

সুখিম্বার সামনে বিশাল অগ্নিকুন্ড। লেলিহান অগ্নিশিখা। দু-হাতে কিসের চর্বি মেখে এসে আগুনের উত্তাপে সেঁকে নিয়ে চোখ বুজে উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকল।

ম্যান্ডেলার হৃৎপিন্ড ধুকধুক করছে। সে কী প্রেতাত্মার কাছ থেকে জেনে নিতে চায়, এমন পবিত্র কাজে সহসা অনাচার সৃষ্টি করছে কে!

ম্যান্ডেলা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

বুনো উলঙ্গ মানুষগুলি সেই উত্থিত হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে হাত নেমে এল—বু বু দামা। বুয়া বুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সবাই নড়াচড়া করছে। ঢাক যারা বাজাচ্ছিল, তারা আবার ঢাক বাজাতে শুরু করল। যারা আগুনে গাছের গুঁড়ি পাহাড়ের নিচ থেকে তুলে এনে ফেলছে, তারা কাঠের গুঁড়ি ফেলতে থাকল। যারা ঘুরে কোমর বাঁকিয়ে বর্শা উঁচিয়ে নাচছিল, তারা নাচতে থাকল। নতুন হরিণের ছাল বিছিয়ে দেওয়া হলো মুম্বাটুর জন্য। যারা আগুনে আস্ত জন্তু পোড়াচ্ছিল, তারা আগুন উসকে দিল। ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে যেতে থাকল। একটা ঝুড়িতে করে সাদা রঙের মিহি ধুলোর মতো কিছু বয়ে আনা হলো। সুখিম্বা মন্ত্র পড়ছে আর অগ্নিকুন্ডে তাই মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দিচ্ছে। ছিটিয়ে দিলেই দপ করে আগুন সহস্রমুখী হয়ে বিশাল গাছের ডালপালায় উঠে যাচ্ছে। বিশাল গাছগুলি বাওবাব গাছ, ম্যান্ডেলা জানে। চারপাশটা দিনের বেলার মতো পরিষ্কার হয়ে উঠলে ম্যান্ডেলা দেখতে পেল পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ির মুখে শয়ে শয়ে নগ্ন মানুষ হত্যে দিয়ে আছে। যে যার মনস্কামনা জানাচ্ছে সেই অগ্নিকুন্ডের কাছে।

যাক, সুখিম্বা জেনে নিতে পারেনি, আত্মারা বলেনি, ম্যান্ডেলা এসে গেছে। সব ভূজুং ভাজুং এবার যাবে। সাবধান। সে যে এখানটায় হাজির, টের পায়নি। ম্যান্ডেলার সাহস বেড়ে গেল।

প্রথমে সেই ঘণ্টাধ্বনি কাজে লাগানো যাক, এমন ভাবল সে। কারণ এই অরণ্য প্রদেশে সে দেখেছে বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি হলে মানুষেরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। নদীতে সাঁতার

কাটার সময় এটা সে টের পেয়েছে। যারা তাকে তেড়ে আসছিল, ঘন্টাধ্বনি শুনে তারাই মাটিতে শুয়ে পড়েছিল।

—হাইতিতি।

কার সুর! কেবল পাশের কেউ কেউ শুনতে পেয়েছে। কে যেন কী বলে ডাকছে!

সবার শুনতে পাওয়ার কথা নয়। এতগুলি ঢাক আর গভীর মন্ত্রোচারণের ধ্বনি এবং জয় দেবার মতো মাঝেমাঝে সমস্বরে চিৎকার উঠলে কে শুনতে পাবে পাশে দাঁড়িয়ে কেউ কাউকে ডাকছে।

দু-পাঁচজন বিভ্রমে পড়ে যাবার মতো এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। চোখের নিচে সাদা চকখড়ির দাগ বলে মুখোশের মতো মনে হচ্ছে সবার মুখ। এমন কি মুম্বাটুর মুখও চিত্র-বিচিত্র। মুম্বাটুর মাথায় সবাই সার দিয়ে দুধ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। এর পর কী হবে সে জানে না। সব দেখার আগে জেনে নিতে হবে, মুহূর্তে এই পাহাড় থেকে সবাইকে সে তাড়িয়ে দিতে পারে কিনা! তার ক্ষমতা একে একে পরখ করে নেওয়া দরকার।

—হা... ই... তি ... তি..., উপরে উঠে ঘুরে ঘুরে ঘন্টাধ্বনি শুরু কর।

ডুং ডাং। ডুং-ডাং।

আর সংগে সংগে সবাই কী আবার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটায়। ছিটকে গেল অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে। ছুটতে শুরু করল। এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাহাড়ের সিঁড়ি ধরে ছুটছে অনেকে।

আর সংগে সংগে আবার সুখিম্বার হাত উত্থিত—সে আকাশের দিকে তার সাদা ধুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে। বারবার। সে ক্ষেপে যাচ্ছে—ঘন্টাধ্বনি থামছে না। সে পাগলের মতো আগুনে এবং ধোঁয়ায় ধুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে।

আশ্চর্য, এর মধ্যে মুম্বাটুর কেবল কোনো বিকার নেই। সে যেন বরং দেরি হচ্ছে ভেবে বিরক্তই হচ্ছে। সুখিম্বার গলা থেকে সেই গমগম আওয়াজ—বাওয়া বো, ডুংগা ডুংগা।

ম্যান্ডেলা ফিক করে হেসে ফেলল।

সুখিম্বা বলল, ডুংগা, ডুংগা!

আরে! পাশে দাঁড়িয়ে কার এত সাহস তাকে উপহাস করে! সুখিম্বা দাঁত কিড়মিড় করছে, আর দেখছে—উপরের ঘন্টাধ্বনি থামছে না।

কিন্তু যেটা ভাবিয়ে তুলল ম্যান্ডেলাকে, তা বড়ই মারাত্মক ঘটনা। সে ধূর্ত এবং উন্মাদ সুখিম্বার আচরণে টের পেয়েছে, অরণ্যবাসীদের সুখিম্বা অভয় দিচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মারা সব এসে গেছেন। ডুং-ডাং ঘন্টা বাজিয়ে তারা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন এবার শুভ কাজ শুরু হতে পারে।

ম্যান্ডেলা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

আবার ঢাক বাজনা শুরু হলো।

আবার নাচ শুরু হলো।

পদ্মপাতায় ভোজ শুরু হলো।

সুখিম্বা এবার একটা মুরগির গলা কেটে আগুনে আহুতি দিল।

সুখিম্বা দাঁড়িয়ে আছে আগুনের পাশে। মুখ চকচক করছে। আলখাল্লায় জোনাকি পোকা জ্বলছে।

ম্যান্ডেলা একটা জোনাকি পোকা তুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। হাত দিতেই বুঝেছে, চটচট করছে আঠায়। পোশাকে কিসের আঠা মাখানো। জোনাকি পোকাগুলি সে আঠায় আটকে আছে। হাত লাগতেই সুখিম্বা অন্যমনস্ক। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছাকাছি কাউকে দেখতে না পেয়ে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু চতুর সুখিম্বাও জানে, ঘাবড়ালে সব যাবে। সে জানে, তার মৃত্যু সিংহের মতো হিংস্র জন্তুর হাতে। তার রোগভোগ দেখা দিলে, সে অচল হয়ে পড়লে, তাকে রেখে আসা হবে গভীর জংগলে। তার খাবার এবং জল মাটির পাত্রে রেখে তার স্বজাতিরা ফিরে যাবে যে যার ঘরে। বনের হিংস্র জন্তুরা তার অস্থি মাংস মজ্জা চেটেপুটে খাবে। সুখিম্বাদের মরণ নেই। জ্যান্ত থাকতেই তারা হিংস্র প্রাণীর আহার হয়ে যায়। তাদের আত্মা প্রাণীদের মধ্যে বেঁচে থাকে এ-ভাবে। বনের পশুরা সুখিম্বাদের আত্মা বয়ে বেড়ালে অরণ্য রাজ্যের মংগল। স্বজাতির জন্য তারা সব বিসর্জন দেয়। ফনের রাজত্বে সেও দ্বিতীয় ফন। মুম্বাটুর মধ্যে যে সব লক্ষণ ফুটে উঠছে, হয় সে ফন হবে, নয় সুখিম্বা হবে। সে এটা চায় না। তার বংশের কেউ না কেউ সুখিম্বা হবার কথা। কিন্তু এই মুম্বাটু পথের কাঁটা। তার আজ মরণ! ভাবতেই কী অট্টহাসি।

সবাই দেখছে সুখিম্বা হাসছে। ভুঁড়ি নাচছে তার। হাহাক্কার হাসি। সে একটা ধনেশ পাখির গলা কেটে রক্ত চুষে খেল, তারপর পাখিটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিল। এর পর এল বনের সব জীবজন্তুর লেজ, পাখির পালক। শিকার করার পর লেজ কেটে রাখা হয়, এতে শিকারীদের উপর বনের দেবতার কোপ থাকে না। এখন সেই সব লেজ কিংবা পালক পোড়ার দুর্গন্ধ উঠছে।

ম্যান্ডেলার বমি পাচ্ছিল।

মুম্বাটুকে চিতাবাঘের ছাল পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ম্যান্ডেলা কী করবে বুঝতে পারছে না।

লোকগুলি আবার মাতাল হয়ে উঠছে।

সে হাইতিতিকে নামিয়ে এনে বলল, চুপ, একদম চুপ। নড়বে না। মুম্বাটুর দিকে তাকালেই তার চোখ ছলছল করে উঠছে। সে তার দাদুকে কথা দিয়ে এসেছে মুম্বাটুকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু ফিরিয়ে দিলে মুম্বাটুকে নিয়ে বুড়ো কোথায় যাবে! বুড়ো কী পালিয়ে ফনের রাজ্য ফেলে অন্য কোনো উপজাতি এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেবে!

আসলে বুড়োরও মাথার ঠিক নেই। মুম্বাটুর কথা ভেবে সে পাগল হয়ে আছে। মুম্বাটুকে যে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না সে ভালই জানে। মুম্বাটুর চোখ দুটো ভারি সুন্দর। হাত-পা'র পেশী শক্ত হয়ে উঠছে। ইস, মুম্বাটুর মায়ের কী না কষ্ট!

এদিক ওদিক মশাল জেলে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পাহাড়ে ওঠার মুখে সারি সারি মশাল জ্বলছে। এত আঁচ অগ্নিকুণ্ডে যে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। উত্তুরে হাওয়ায় আগুন গনগন করছে। মুম্বাটুকে তার উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হবে।

সব ক্রিয়াকান্ড শেষ হলে আগুনের চারপাশে সবাই ঘুরে ঘুরে নাচছে। মুম্বাটু বসে আছে—সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। নাচ শেষ হলে মনে হলো, মুম্বাটু দূরে তাকিয়ে আছে। কারো প্রত্যাশা করছে।

ঐ তো মুম্বাটুর মা। চোখ পাতার ঝালরে ঢাকা। হাত ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

না, আর পারা যাচ্ছে না। ম্যান্ডেলা হঠাৎ সুখিম্বার কাছে দৌড়ে গিয়ে ভুঁড়িতে সুড়সুড়ি দিতে থাকল। সুখিম্বা কানামাছি খেলার মতো হাত দিয়ে তাকে ধরতে চাইছে, পারছে না। ম্যান্ডেলা চারপাশে ঘুরে লোকটার ভুঁড়িতে সুড়সুড়ি দিয়েই পালাচ্ছে। হা হা হি হি–তারপরই সুখিম্বা রাগে ফুঁসছে। কে এমন বেয়াদপ যে তার ভুঁড়িতে হাত দেয়, অথচ দেখা যায় না, ধরা যায় না। সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে আর কী চিৎকার করে বলছে।

বোধ হয় বলছে, তাদেরকেও কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে কিনা। আসলে তার সুখিম্বা মাহাত্ম্য এতই উচ্চমার্গের যে প্রেতাত্মারা স্বয়ং নেমে এসেছে। তাকে ছুঁয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার মতো বড় সুখিম্বা হয় না–ম্যান্ডেলার কী যে রাগ হচ্ছে! সে জোরে জোরে বলছে, দিংগিবো দিংগিবো।

সে বুঝল, এ-সময় তার উচিত মুম্বাটুর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। সে একা এবং প্রায় অনেকটা দূরে আর সবাই। এ-সময় মুম্বাটুর কাছে কেউ যেতে পারে না–সুখিম্বাও না। কেবল মুম্বাটুর মা হেঁটে ছেলের কাছে গেল। পাতার ঝালর তুলে ছেলেকে দেখল। চুমু খেল। মুম্বাটু তার মায়ের পাশে নতজানু হয়ে বসল। আর তখনই ম্যান্ডেলা দেখল মুম্বাটুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওর মা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ম্যান্ডেলা এবার মুম্বাটুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে চিনতে পার?

মুম্বাটু অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে এক বালিকার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মুম্বাটু ইংরাজি জানে। কারণ বুড়োবাবা বলেছে, সেও স্কুলে যায়। ওর কথা মুম্বাটু বুঝতে পারছে।

মুম্বাটু বলল, আপনি কোনো অশরীরী?

–আমি অশরীরী না। আমি ম্যান্ডেলা। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

–কোথায়?

–তা তো জানি না।

–আমি যেতে চাই না। আমি গেলে আমাদের উপজাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে। অজন্মা হবে। মড়ক লাগবে। সুখিম্বার অভিশাপে পুড়ে সব ছারখার হয়ে যাবে।

–কিচ্ছু হবে না।

মুম্বাটু হেসে বলল, তুমি আমার পূর্বপুরুষের কেউ হও!

একবার বলার ইচ্ছা হলো, আমি তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা। তারপর ভাবল মিছে কথা বলে কী লাভ! এতে তো কারো উপকার করা যাবে না। সে বলল, আমি তোমার পূর্বপুরুষের কেউ না। আমি প্রেতাত্মাও নই। এই দেখ। বলে সে পালকের টুপি খুলে ফেলতেই সাদা ফ্রক পরা নীল চোখের এক বালিকা। গায়ের চামড়া হাঁড়ির ভাতের মতো ফুটে ফুটে জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে।

নিমেষে ঢাকের বাদ্য থেমে গেল।

সুখিম্বা ওম্বা ওম্বা বলে চিৎকার করে উঠল।

যে যেখানে ছিল একেবারে থ। ফ্রক পরা এক বালিকা এখানে এল কী করে! কেউ কেউ অমঙ্গল ভেবে সুখিম্বার মতোই ওম্বা ওম্বা বলে চিৎকার করছে।

ম্যান্ডেলাকে ধরার জন্য ছুটে এলে

তারপরই তারা ম্যান্ডেলাকে ধরার জন্য ছুটে এলে সে পালকের টুপি পরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোঝা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। তাড়াতাড়ি করা দরকার। সুখিম্বা পড়িমরি করে ছুটে গেল মুম্বাটুর কাছে। তার কোনো অহিতকারী প্রেতাত্মা এসে হাজির হয়েছে এখানে। সাদা মানুষকে এমনিতেই তারা এড়িয়ে চলে। এরাই এক সময় ওদের শেকল বেঁধে সমুদ্রের ওপারে জাহাজে তুলে নিয়ে গেছে। এদের দেখলে আগে দল বেঁধে তার পূর্বপুরুষরা ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকে আক্রমণ করত। এখন অবশ্য করে না। বুড়োবাবা এসে সবাইকে অভয় দিয়েছে। সুখিম্বা তার ঠাকুরদার আমলের গল্প থেকে জেনেছে সব–কী নৃশংস অত্যাচার চলত। নারী-পুরুষ একসঙ্গে শেকলে বেঁধে জাহাজে তোলা হতো, গাদাগাদি করে রাখা হতো। অর্ধেক মরে যেত জাহাজেই। মৃতদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হতো। এক সাদা মানুষের প্রেতাত্মা, কালো মানুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়ার অর্থই সব ভন্ডুল করে দেওয়া। ফন নিরাময় হোক না হোক, তার যে চাই মুম্বাটুকে আগুনে পোড়ানো!

মুম্বাটুকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিচ্ছে সুখিম্বা। কে জানে বেটা যদি পালায়! অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারলে সব যাবে।

কিন্তু মুম্বাটু পাঁজাকোল থেকে জোরজার করে নেমে পড়ল।

সে নির্ভীক। মরতে ভয় পায় না।

সে হেঁটে যেতে থাকল।

ম্যান্ডেলা এবার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। পালকের টুপি খুলে বলল, যাবে না। বলছি, যাবে না।

কিন্তু মুম্বাটু শুনছে না।

মুম্বাটু কেমন যেন ঘোরে পড়ে গেছে। এই ঘোর থেকে কিভাবে যে তাকে উদ্ধার করবে ম্যান্ডেলা বুঝতে পারছে না।

আবার সেই ভিড়ের মানুষগুলি দেখল সোনালী চুলের মেয়েকে। তারা ভয়ে কাঁপছে। কোন অশুভ প্রেতাত্মার উৎপাত শুরু হলো বুঝতে পারছে না। ভিড়ের মানুষগুলি যাতে ভয় না পায়, সুখিম্বা একটা বর্শা তুলে ছুঁড়ে মারার আগেই ম্যান্ডেলা সরে গেল। আবার পালকের টুপি পরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে তার সঙ্গে সুখিম্বার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সে চায় না কেউ মারা যাক। মানুষ তো মরে যাবেই, কিন্তু অপঘাতে মরা পাপ। সে এও বুঝেছে মুম্বাটুকে শুধু উদ্ধার করলেই চলবে না, তার ঘোরও কাটাতে হবে। এ-জন্য মুম্বাটুকে একা পাওয়া দরকার। সে কিভাবে যে লড়বে বুঝতে পারছে না। যারা নাচছিল, গাইছিল, আগুনে কাঠ ফেলছিল, মাংস পোড়াচ্ছিল তারা একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে এক বালিকার সঙ্গে সুখিম্বার মহারণ শুরু হয়েছে। সুখিম্বাকে এমন ত্রাসে পড়ে যেতে তারা কখনও দেখেনি।

ম্যান্ডেলা যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল এবং যেখানে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিকটায় লক্ষ্য করে একের পর এক বর্শা ছুঁড়তে থাকল সুখিম্বা। ইস, হাইতিতিটা পাগল নাকি। সে এরই মধ্যে লাফাচ্ছে। লেগে গেলে যে কী হবে না!

মুম্বাটু অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবে এবার। সঙ্গে সঙ্গে ম্যান্ডেলা তাকে দু-হাতে জাপটে ধরল। মুম্বাটু ঠিক বুঝতে পারছে না। কেউ তাকে জাপটে ধরেছে বুঝতে পারছে—জোরজার করতে গিয়ে টের পেয়েছে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদছে—কান্নার শব্দ তো আড়াল করতে পারে না। মুম্বাটু বলল, দেবী, তুমি আমাদের উপজাতির কোনো অমঙ্গল ডেকে এনো না। দোহাই তোমার ঈশ্বরের। আমাকে ছেড়ে দাও।

ম্যান্ডেলা বলল, পাগলামি করবে না।

মুম্বাটু বলল, তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না—অথচ হাত দিলে বুঝতে পারছি তুমি আছ। আমি কী অন্ধ হয়ে গেছি! আমাকে তুমি জড়িয়ে আছ।

—শোনো, তোমার দাদু, তোমার মা'র কথা ভাব। তোমার বাবার কথা ভাব। তুমি ঘোরে পড়ে গেছ। তোমাকে ঠিক কিছু খাওয়ানো হয়েছে। বলে টানতে টানতে অগ্নিকুণ্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে সুখিম্বা ছুটে আসতে থাকল। হাতে বর্শা। ম্যান্ডেলাকে না মুম্বাটুকে বর্শা ছুঁড়ে মারবে বোঝা যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা মশাল তুলে ম্যান্ডেলা সুখিম্বার দিকে তেড়ে গেল।

মশালটা কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বাতাসে ভেসে চলেছে যেন। সুখিম্বা আর্তনাদ করে উঠল। ম্যান্ডেলা আর ক্ষমা করবে না। এমন শান্ত নিরীহ এক বালককে মেরে ফেলার চক্রান্ত সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। দরকার হয় ফনের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। বলবে, সব বুজরুকি। দরকার হয় সে বাতাসে ভেসে যাবে ইয়াউন্ডোতে। যেমন সে একবার এক নির্জন দ্বীপ থেকে একজন বুড়োমানুষকে উদ্ধার করার জন্য সমুদ্রে ভেসে গিয়ে কাপ্তানের স্যুপের প্লেট নিয়ে বাতাসে ভেসে গিয়েছিল, দরকার পড়লে তেমন কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে। বড় ডাক্তার নিয়ে আসবে শহর থেকে।

সবাই দেখছে, হাওয়ায় মশাল ভেসে যাচ্ছে। সুখিম্বা দৌড়াচ্ছে। সুখিম্বা পালাচ্ছে। ম্যান্ডেলাকে দেখা যায় না। সে পালকের টুপি পরে মশাল হাতে নিলে এমনই তো হবার কথা। আর নিচে যারা ছিল, কিংবা যে যেখানে ছিল সবাই পালাচ্ছে। সুখিম্বা আর্তনাদ করে হঠাৎ পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে পড়ে গেল। নিচে গভীর খাদে পড়ে গেল। আর ফিরে তাকাতেই দেখল মুম্বাটুও ভয় পেয়েছে। এ-ভাবে বাতাসে আগুনের গোলা ভেসে যেতে থাকলে, ভয় হবারই কথা!

কিন্তু মুম্বাটুকে ওর স্বজাতিরা যে আর গ্রহণই করবে না। স্বজাতির এলাকায় ঢুকলে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে তাকে। সে যাবে কোথায়! কোথায় যাচ্ছে! পাহাড়ের ঢালুতে কোথায় নেমে যাচ্ছে একা। ম্যান্ডেলা বাধ্য হয়ে এবার সামনের একটা পাথরে উবু হয়ে বসল। এইদিকেই নেমে আসছে মুম্বাটু। সে পাথর থেকে নিচে লাফিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পালকের টুপি সে পকেটে রেখে মশাল তুলে বলল, তুমিও ভয় পেয়ে ছুটেছ! আমি ম্যান্ডেলা। বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। জান আমার বাবা জাহাজডুবীতে নিখোঁজ। বলতেই মুম্বাটুর কেমন খারাপ লাগল। কারণ মুম্বাটু বিশ্বাসই করতে পারছে না ম্যান্ডেলা সাধারণ এক বালিকা। কিন্তু একজন সাধারণ বালিকার পক্ষে তো এই গভীর অরণ্যে আসা দুঃস্বপ্নের সামিল।

ম্যান্ডেলা এবার ওর হাত ধরে বলল, তুমি জান বুড়োবাবাকে?

—জানি।

—বুড়োবাবার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

—কেন?

—বুড়োবাবার স্কুলে পড়বে। সেখানেই থাকবে। আমি বুড়োবাবাকে বললে, তোমাকে স্কুল হস্টেলেই রেখে দেবেন।

—আমি তো বুড়োবাবার স্কুলে পড়ি।

—ছুটির সময় তোমাকে দেশে ফিরতে হয়?

—তা হয়।

—ছুটির সময় তুমি দেশে ফিরে আসতে পারবে?

মুম্বাটু তার বিপদের কথা বুঝে চুপ করে রইল। বড়দিনের কিংবা গ্রীষ্মের ছুটিতে হস্টেল খালি করে দিতে হয়। তখন সেখানে কিছুদিনের জন্য সেনাদের ব্যারেক হয়ে যায়। কাউকেই রাখা হয় না।

ম্যান্ডেলা বলল, বুড়োবাবাকে বললে হয়ে যাবে। বুড়োবাবা ভাবতেই পারবে না তুমি বেঁচে গেছ।

—বুড়োবাবা জানে!

ম্যান্ডেলার দিকে মুম্বাটু অপলক তাকিয়ে আছে। বলছে, তুমি কী করে অদৃশ্য হয়ে যাও বুঝি না।

ম্যান্ডেলা যাদুকরের টুপির কথা বর্ণনা করল। কিভাবে পেয়েছে বলল। শুনে মুম্বাটু অবাক। বাতাসে ভেসে যাওয়া যায়, বলে কী! কিন্তু ম্যান্ডেলা পালকের গুণের কথা বলে বোধ হয় ভাল করেনি। কাউকে বলা বারণ। তখনই সে শুনতে পেল মুম্বাটু নিষ্পাপ। তাকে বললে দোষের না। এক

অদৃশ্যলোক থেকে জাদুকরের গলা শুনতে পাচ্ছে।

ম্যান্ডেলা বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না। পরে দেখ না।

আমার ভয় করছে।

—পর বলছি মুম্বাটু।

মুম্বাটু যেই না পালকের টুপি পরেছে, ব্যস, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না! ম্যান্ডেলা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। মুম্বাটু যদি উড়ে চলে যায় কোথাও, আর না আসে! ম্যান্ডেলা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কী করবে বুঝতে পারছে না।

—ম্যান্ডেলা, তুমি কী বোকা!

আরে পাশে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে! মুম্বাটুর গলার স্বর। সে উড়ে কোথাও যায়নি। তাকে ফেলে বোধহয় মুম্বাটু কোথাও আর যেতে পারবে না। পালকের টুপি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, নাও। কিন্তু এই গভীর অরণ্যের অন্ধকারে তখন জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তা নেমে গেছে নিচে। মুম্বাটু জানে, তারা এই রাস্তায় যেতে পারবে না। এই গভীর বনের সব তার চেনা। গাছপালা, হিংস্র শ্বাপদের শব্দে সে টের পায়, চিতাবাঘ না হায়েনা। তার এখন বড় কাজ এই ছোট্ট মেয়েটাকে শহরে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, সে জানে, ম্যান্ডেলা তাকে একলা ফেলে কোথাও যেতে পারবে না। সে উড়ে গেলে ম্যান্ডেলা পড়ে থাকবে। ম্যান্ডেলা উড়ে গেলে সে পড়ে থাকবে। এই যখন অবস্থা, এবং নিচে যারা পালিয়ে গেছে তারা গাছের আড়ালে ওৎ পেতে আছে—কারণ পৈশাচিক কোনো ঘটনা, তাদের এই মঙ্গল অনুষ্ঠান ভেস্তে দিয়েছে, মুম্বাটুর উপর পূর্বপুরুষের আত্মারা খুশি না, তাকে আত্মারা গ্রহণ করেনি—সে তার স্বজাতির কাছে অস্পৃশ্য, স্বজাতিরা তার চোখ উপড়ে না নিলে আত্মারা খুশি হবে না—কাজেই সে ম্যান্ডেলার হাত ধরে যেদিকটায় ক্রস নদী বয়ে চলেছে সেদিকটায় রওনা হবে ভাবল। তারপর কী ভেবে ম্যান্ডেলাকে বলল, দাঁড়াও। আমি আসছি। উপরে বিধ্বস্ত বনভূমি। বর্শা, তীর ধনুক সব পড়ে আছে। বেছে বেছে কটা তীর একটি বর্শা সে তুলে নিয়ে আবার ম্যান্ডেলার কাছে ফিরে এল।

মুম্বাটু এখন কাউকে ভয় পায় না।

সে বলল, ম্যান্ডেলা, সকাল না হলে যেতে পারব না। জঙ্গলের ঝোপে কোথাও আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। আমার ঘুম পাচ্ছে। এখানে আমরা দুজনে রাতটা কাটিয়ে দেব।

—আমরা দুজন না। আর একজন আছে। ম্যান্ডেলা তুড়ি মারতেই হাইতিতি কাছে চলে এল। ম্যান্ডেলা রুপোর ঘণ্টা খুলে ফেললে মুম্বাটু দেখল—ছোট্ট একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা।

সে অবাক হয়ে বলল, আরে এ কোথা থেকে!

ম্যান্ডেলা হেসে বলল, ও সব বুঝতে পারে। জঙ্গলের কোন দিকটা নিরাপদ সেই খবর দেবে। নাম হাইতিতি। আমাদের অন্তত নিরাপদ একটু আশ্রয় দরকার। শীগগির হাঁট। আগে তোমার দাদু, মা-বাবার সঙ্গে গোপনে দেখা করব। তোমার দাদুকে যে কথা দিয়েছি। ইস, বুড়ো তোমাকে দেখলে কী না খুশি হবে!

ছবি: প্রসাদ রায়

মুম্বাটু আগে, ম্যান্ডেলা পেছনে। এদিককার রাস্তাঘাট মুম্বাটু খুব ভাল চেনে না। আসলে ম্যান্ডেলা বাঘের তাড়া খাওয়ার মতো মুম্বাটুকে নিয়ে ছুটছিল। তাকে পেলেই মুম্বাটুর স্বজাতিরা আগুনে ঝলসে মাংস খাবে। মুম্বাটুও নিস্তার পাবে না। সুখিম্বার আত্মা তাকে তাড়া করবে।

কারণ মুম্বাটু জানে, সুখিম্বার অতৃপ্ত আত্মা কাউকে নিস্তার দেয় না। সুখিম্বার মৃত্যু ইচ্ছামৃত্যু। সেই সুখিম্বাকে আগুনের গোলা তাড়া করতেই খাদের অতলে পড়ে গেল। ম্যান্ডেলা বলেছে, এত উপর থেকে গড়িয়ে পড়লে কেউ বাঁচে না। মুম্বাটু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ম্যান্ডেলা হয়তো জানে না, সুখিম্বাদের মৃত্যু হয় না। উপজাতি সর্দার ফন বিশ্বাসই করবে না—মুম্বাটুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা যায়নি। কোত্থেকে এক বালিকা এসে তাকে রক্ষা করল—রহস্য! কখনও তাকে দেখা যায়, কখনও সে অদৃশ্য। বাতাসে ঘন্টা বাজে। যারা পূর্বপুরুষদের আত্মাকে খুশি করার জন্য মুম্বাটুকে অগ্নিকুণ্ডে উৎসর্গ করতে চেয়েছিল তারাও এতক্ষণে খবরটা ঠিক পৌঁছে দিয়েছে। ফনের রাজত্বে ঘোর অনিয়ম।

ফন বিরক্ত হতেই পারে।

তাছাড়া ফনের গুরুতর অসুখ।

তার অসুখ নিরাময় হচ্ছে না বলেই তো প্রধান গুণিনের বিধানমতো মুম্বাটুকে পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে উৎসর্গ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলেই আত্মারা খুশি হয়ে ফনকে নিরাময় করে তুলবে। মুম্বাটুকে পরিবর্তে গ্রহণ করবে। গ্রহণ না করলে মৃত্যু অনিবার্য। সেই ফন যখন শুনবে উপজাতিদের প্রধান গুণিন খাদে পড়ে গেছে, মুম্বাটু পালিয়েছে, তখন মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না। তা ছাড়া অসুখ। পেট ফুলে গেছে—চোখ ঘোলা ঘোলা—সারাক্ষণ বল্লম হাতে পায়চারি করছে একদল প্রহরী। হাতে বর্শা,

অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় পালকের টুপি। পরনে উটপাখির পালকের আচ্ছাদন–হাতে-পায়ে নানা বর্ণের উল্কি আঁকা। মুখে নীল লাল রঙের আঁকিবুকি। সবই ফনের মঙ্গলের জন্য, নিরাময়ের জন্য। ফনের দুর্গের শেষ দিকটায় প্রেতাত্মাদের ঘর। সেখানেও চলছে পূজা-আর্চা। রোজ বড় বড় বলদ বলসানো হচ্ছে। লোকজন খাওয়ানো হচ্ছে। শুকনো ঘাস জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে–প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে প্রেতাত্মার ঘর। দেয়ালে করোটি ঝুলছে।

তাছাড়া এত অন্ধকার যে কোনদিকে যাচ্ছে ম্যান্ডেলা বুঝতে পারছে না। মুম্বাটু বলেছিল, বুড়ো বাবার কাছে যেতে হলে ক্রস নদী পার হতে হবে। একমাত্র বুড়ো বাবার এলাকার মধ্যে ঢুকতে পারলেই মুম্বাটুকে রক্ষা করা যাবে। বড় গীর্জার ছায়াময়, ছোট্ট এক ঘরে বুড়ো বাবা থাকেন। লণ্ঠন হাতে তিনি রাতে বের হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে যীশুর জন্মকাহিনী, কুষ্ঠ রুগীর আরোগ্যলাভ, অন্ধজনে দেয় আলোর খবর দেন। বুড়ো বাবাকে ঘাঁটাতে কোনো জাঁদরেল ফনই সাহস পায় না।

কিন্তু ম্যান্ডেলা যে মুম্বাটুর দাদুকে বলে এসেছিল, ভয় নেই। মুম্বাটু বেঁচে যাবে। তোমরা কান্নাকাটি কর না, মুম্বাটুকে নিয়ে আমি ঠিক ফিরে আসব।

ওরা তো পালিয়ে অপেক্ষা করবে।

আবার করতে নাও পারে। মুম্বাটুর দাদু ম্যান্ডেলার কথা শুনে শিউরে উঠেছিল। বলে কী বাচ্চা মেয়েটা! সে তো জানে না, যদি মুম্বাটুকে পূর্বপুরুষদের আত্মারা গ্রহণ না করেন, তবে তার উপজাতির উপর অভিশাপ নেমে আসবে। প্রচন্ড খরা দেখা দেবে। শস্য হবে না। গাছপালায় পাহাড়ে দাবানল জ্বলবে।এমন কী অভিশাপে গোটা উপজাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

সব শুনে ম্যান্ডেলার কী যে রাগ হচ্ছিল! হয়! কখনও হয়! কার অসুখ হলো, কাকে পুড়িয়ে মারা হলো, কে নিরাময় হয়ে গেল, কখনও হয়! সে বুঝিয়েছে, দাদু তোমার একদম বুদ্ধি নেই। অসুখ হলে ডাক্তার কবিরাজ লাগে। গুণিন কিছু করতে পারে! মানুষ মরতে বসলে কেউ বাঁচাতে পারে!

তখনই মুম্বাটুর দাদু তটস্থ হয়ে পড়েছিল। বাচ্চা মেয়েটা কোথা থেকে এল, কীভাবে এল, এমন গভীর বনজঙ্গলে একটা সুন্দর টুকটুকে ফর্সা মেয়ে, নীল চোখ, সোনালি চুলের মেয়ের আবির্ভাবও তার কাছে কম বিস্ময়ের ছিল না। বড় বড় চোখে তাকে শুধু দেখছিল। না কী পূর্বপুরুষরাই পাঠিয়েছে–কে জানে! সে বলেছিল, 'তুমি দেবী হও, দানবী হও মুম্বাটুকে রক্ষা কর, বলতে বলতে কান্নায় তার দাদু দু হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়েছিল। পরনে পাখির পালক, হাতে ধনেশ পাখির হাড়, আর নাকে বড় নোলক, দু-কানে লোহার আংটা। কালো কুচকুচে, চোখ কোটরাগত মানুষটা গাঁয়ের গরু ছাগল মুরগির পাহারাদার সেজে বসেছিল–আর দূরে পাহাড়ের মাথায় ছিল চোখ। সেখানে সব উপজাতির লোকেরা সেজেগুজে রওনা হয়ে গেছে–নাচছে, গাইছে। আগুন জ্বলে উঠেছিল–দূর থেকে, প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ দূর থেকে আগুন জ্বলে উঠলে নিথর হয়ে গেছিল মুম্বাটুর দাদু। নিয়তি। কিছুই করার নেই। নিয়ম, বাবা-মাকেও সেখানে থাকতে হবে। মুম্বাটুর বাবা-মাও সেজেগুজে রওনা হয়ে গেছিল। সুখিম্বার বিধান, কারো কিছু করার নেই।

ম্যান্ডেলা ডাকল, 'মুম্বাটু, কোন দিকে তুমি!'

আসলে অন্ধকার আর বিশাল সব বাওবাব গাছ এবং

পাথর, ঘাস-বনজঙ্গল মিলে আড়াল করে দিচ্ছিল মুম্বাটুকে। সে দু-দশ গজের মধ্যে মুম্বাটু থাকলেও দেখতে পাচ্ছে না।

মুম্বাটু বলল, 'এখানে।'

এই উপত্যকার বনজঙ্গলে, গভীর রাত্রিরে শুধু কথা ছাড়া কার কোথায় উপস্থিতি বোঝা যায় না। মাঝে দূরে অদূরে হায়েনার আর্তনাদ।

একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে।

কী পাখি ম্যান্ডেলা নাম জানে না।

মাথার উপর বিশাল আকাশ আর নক্ষত্র। ম্যান্ডেলা ইচ্ছে করলে যে উড়ে যেতে পারে, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, মুম্বাটু তা জানে। ম্যান্ডেলার পকেটে আছে যাদুকরের টুপি। পালকের টুপি মাথায় পরে ম্যান্ডেলা দ্বীপে, অরণ্যে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, সমুদ্রের বালিয়াড়িতে বাবাকে খুঁজতে বের হয়। জাহাজডুবিতে বাবা নিখোঁজ। মেয়ে তো! বাবার জন্য প্রাণ কাঁদে। মন আনচান করে উঠলেই সে পালকের টুপি পরে নেয়। তার প্রিয় ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা সংগে থাকে। গলায় রুপোর ঘন্টা বেঁধে দেয়। তারপর যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। যত অগম্য হোক, দুর্গম হোক রাস্তা,ম্যান্ডেলার আসে যায় না।

আসলে মুম্বাটু বোঝে, তাকে নিয়েই ঝামেলায় পড়েছে ম্যান্ডেলা। ঘাসের প্রান্তরে ঢুকে গেছে তারা। সে না থাকলে বুড়ো বাবার গীর্জায় এক দন্ডে উড়ে চলে যেতে পারত ম্যান্ডেলা। তাকে পালকের টুপি পরে দেখিয়েছে, সে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে! ওপরে উঠে, আকাশের নিচ দিয়ে ভেসে যাবার সময় কথা বলেছে, 'মুম্বাটু, আমি বাতাসে ভেসে যাচ্ছি। আমার গলার স্বর চিনতে পারছ! ঘণ্টা বাজছে, টের পাচ্ছ! হাইতিতির গলায় রুপোর ঘণ্টা। ঘণ্টা নড়লেই বাজে— কী মিছে কথা বলেছি!'

'তুমিও পরে দেখতে পার।' বলেই ম্যান্ডেলা মুম্বাটুর মাথায় টুপি পরাবার আগে বলেছিল, 'উড়বে, যেখানে যেতে চাও চলে যেতে পারবে। আবার আমার কাছে ফিরে আসার বাসনা হলে, ফিরেও আসতে পারবে। কী মজার টুপি না! যাদুকর বসন্তনিবাস দিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে জান—সেখানকার লোক। ছোটবাবুর সংগে আমাদের পাইনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। পাইন ফ্যাস্টিভ্যালে বাঁশি বাজাত। আমরা শহরের ছোট শিশুরা দেখতাম, সে আসছে। জেটি থেকে উঠে আসছে।

গায়ে তার নানা রঙের আলখাল্লা।

গায়ে তার পোশাক, তায় অজস্র পকেট। পকেট ভর্তি চকলেট। শিশুদের সে খুব ভালবাসত। পকেট থেকে চকলেট দিত!'

ম্যান্ডেলা অন্ধকারে হাঁটার সময় যাদুকরের গল্প করছিল, 'জান মুম্বাটু, যেদিন জাহাজ ছেড়ে দিল, সে কী কান্নাকাটি! আমরা জেটিতে হাউ হাউ করে কাঁদছিলাম।'

'জাহাজ!' মুম্বাটুর প্রশ্ন।

'আরে জান না, যাদুকর বসন্তনিবাস যে নাবিক। সে তো এক বন্দরে বেশি দিন থাকতে পারে না। যাদুকরের পোশাক পরে সে শহরে উঠে আসত। মাথায় তার পালকের টুপি থাকত।'

'পালকের টুপি কেন?' মুম্বাটুর প্রশ্ন।

'আরে তুমি বুঝছ না, যাদুকরের মাথায় পালকের টুপি থাকে। ঐ টুপিটাই তো তাকে যাদুর মানুষ করে দেয়। সে যা ভাবে, তাই করতে পারে। ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হতে পারে। ইচ্ছে করলে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। ম্যাগাগন পাহাড় থেকে মিমোসা ফুল নিয়ে আসতে পারে। সে পারে না হেন কাজ নেই।'

মুম্বাটু যেতে যেতে শুনছে সব। ম্যান্ডেলা তাকে বলছে, এক সকালে সে সমুদ্রের ধারে যাদুকরকে আবিষ্কার করেছিল। বসন্তনিবাস তাদের শহরে দেশে চলে যাবার পর সব শিশুরা সমুদ্রের ধারে বসে থাকত। সে তো বলে গেছে, আবার আসবে। আসে না কেন! মা-বাবারা আর কী করে! তাদেরও এক কথা, সময় হলে তো আসবে। যাদুকরের কত কাজ!

মা-বাবারা বলত, 'তোমাদের মতো সারা পৃথিবীতেই শিশুরা বড় হয়ে ওঠে। সবাই তো যাদুকরকে চায়। সে কত দিক সামলাবে। সময় পেলেই আবার চলে আসবে।' ম্যান্ডেলার মা সমুদ্রের ধার থেকে এমন সব কথা বলেই নাকি তাকে নিয়ে আসত। সেই ম্যান্ডেলা সত্যি একদিন দেখে ফেলল একটা পাথরের মূর্তি পড়ে আছে বেলাভূমিতে। হুবহু যাদুকর বসন্তনিবাসের মতো। আর কী সে সেখানে থাকে! সে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ছুটছিল—সে সব গল্পও মুম্বাটুকে শুনিয়েছে। তারপর সে একদিন সমুদ্রের ধারে যাদুকরের মূর্তির নিচে বসেছিল—বাবা আসছে না। বাবার জাহাজ ফিরে আসছে না। বাবা নিখোঁজ। সে কাঁদছিল।

তারপর কীভাবে পালকের টুপি পেয়ে গেল ম্যান্ডেলা, এখন তা ঠিক মনে করতে পারে না।

কখনও মনে হয় স্বপ্নে পেয়ে গেছে।

কখনও মনে হয়, যাদুকর তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল—বলেছিল, 'এই মেয়ে, কাঁদছ কেন?'

'জান আমার বাবা সমুদ্রযাত্রায় গেছে—সেই কবে। ফিরে আসছে না। বাবা আমাকে কী ভালবাসত।'

মুম্বাটু শুনে হেসেছিল, 'সব বাবারাই মেয়েকে ভালবাসে।'

ম্যান্ডেলা বলত, 'কিচ্ছু জান না! জান বাবা আমাকে কত ভালবাসত।

চাই তাহিতির পাখা।

এসে গেল।

চাই মিমোসা ফুলের স্তবক।

এসে গেল।

চাই সিংহলের কাঠের হাতি।

এসে গেল!

চাই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা।

বাবা তাও নিয়ে এল। আচ্ছা বল সেই বাবা ফিরে না এলে খারাপ লাগে না! চোখে জল আসে না! মা আমার চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকে। জান পাহাড়ের উপর আমাদের লাল নীল রঙের কাঠের বাড়ি। কত দেশ থেকে বাবা কত বিচিত্র গাছ এনে লাগিয়েছে। মা এখন শুধু গাছের যত্ন করে। যেন গাছগুলি বেঁচে থাকলে, বাবাও আমার বেঁচে থাকবে। মা তো জান, কিছুতেই বিশ্বাস করে না, পালকের টুপি পেয়েছি। বলে কিনা মিছে কথা। তবে মা এখন বিশ্বাস করে যে, আমি কিছু

একটা পেয়েছি। দু-এক হপ্তা বাড়ি না ফিরলে মা আর খোঁজাখুঁজি করে না। বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি টের পায়।'

প্রায় গা ঘেঁষে দু-জনে অন্ধকারে হাঁটছে।

সহসা ম্যান্ডেলার মনে হলো হাইতিতির সাড়াশব্দ পাচ্ছে না। পাজিটার যে মাথায় কখন কী দুর্বুদ্ধি গজায়! জঙ্গলে লুকিয়ে ম্যান্ডেলাকে এভাবে কতবার যে ভয় দেখিয়েছে! হাইতিতি বোঝে না, এটা আফ্রিকার জঙ্গল। কখন বাঘ-ভালুকের উপদ্রবে পড়ে যাবে–সে ডাকল, 'হাইতিতি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের জঙ্গল থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এল। যেন কী সুবোধ বালিকা! পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

অন্ধকারে কী করা যাবে ম্যান্ডেলা বুঝতে পারছে না। মুম্বাটু কেবল সতর্ক নজর রাখছে। সে তার হাতের লাঠি দিয়ে সপসপ শব্দ করে হাঁটছে। সাপ বাঘের উৎপাত আছে। ম্যান্ডেলা তো সকালেই একটা বাঘের মুখে পড়ে গেছিল। এমন একটা বনজঙ্গলের দেশে উড়ে এসে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট উপত্যকার মতো ঘাসের চারণভূমি দেখেই তার কেন যে মনে হয়েছিল, রাত কাটাবার পক্ষে অসুবিধা হবার কথা না। নরম ঘাসে সে শুয়ে পড়েছিল। পাশে হাইতিতি। সে পালকের টুপি মাথায় পরে শুয়েছিল। হাইতিতির গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিল।

দুজনেই নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারবে ভেবেই পালকের টুপি পরা। উপজাতির কেউ, কিংবা বনের কোনো হিংস্র প্রাণী–সে যে ঘাসের উপর শুয়ে আছে টেরই পাবে না। পায়ওনি। কিন্তু সকালে উঠেই যা দেখেছিল! পাশে হাইতিতি নেই। একটা প্রকান্ড বড় বাঘ। হাই তুলছে। কী পাজি! ঘুম ভেঙে গেলে কার না হাই ওঠে। তার ঘুম ভাঙলে তো হাই উঠবেই। তাই বলে বাঘটারও হাই উঠবে! বেয়াদপ। সে উঠে গিয়ে লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিল।

গরগর করে উঠেছিল বাঘটা। কিন্তু কিছুই দেখতে না পেলে যা হয়, মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। থাবা দিয়ে মুখ চুলকাচ্ছে। আর নাক টানছে। আসলে মানুষের গন্ধ পাঁউ–বাঘটার বোধ হয় সেই দশা। সে কম মজা করেনি। একটা ঘাসের ডগা নাকের মধ্যে গলিয়ে দিতেই হ্যাঁচ্চো। তারপর পড়িমরি করে দৌড়। বাঘটা ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে।

কিন্তু এখন মুম্বাটু আছে বলে পালকের টুপিটাও মাথায় দিতে পারছে না। কিংবা হাইতিতির গলায় ঘণ্টাও বেঁধে দিতে পারছে না। মুম্বাটু তবে একা হয়ে যাবে।

ঘণ্টা বেঁধে দিলে জঙ্গলে সে আর মুম্বাটু।

পালকের টুপি পরলে, জঙ্গলে একা মুম্বাটু।

এমন সরল সোজা কালো কষ্ঠিপাথরের ছেলেটার জন্য সকাল থেকেই তার কেমন টান ধরে গেছে।

মুম্বাটু সহসা তার হাত ধরে বসিয়ে দিল। ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার ইঙ্গিত। মুম্বাটু এই অরণ্যের রাজ্যের অনেক খবর রাখে। একঝাঁক কী মাথার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল।

মুম্বাটু গুড়ি মেরে আছে। ম্যান্ডেলাকে বলছে, 'তীর ছুঁড়ছে। টের পেয়ে গেছে। আমরা পালাচ্ছি টের পেয়ে গেছে।'

মুম্বাটুকে কিছু বলতে গেলেই, মুখ হাত দিয়ে চেপে দিল ম্যান্ডেলার।

আসলে সব শব্দভেদী বাণ। অন্ধকারে কিছু দেখার উপায় নেই। বনজঙ্গলের ঘাসে শুকনো পাতার ওড়াউড়ি থাকে। হাঁটতে গেলে পাতার খসখস শব্দ শোনা যায়। যারা মুম্বাটুকে ধরার জন্য পিছু নিয়েছে, তাদেরই কাজ।

ম্যান্ডেলা এখন যে কী করে!

ক্রস নদী কতদূর জানে না।

বুড়ো বাবার কাছে সে উড়ে যেতে পারে। গিয়ে খবর দিতে পারে মুম্বাটুর বিপদ। তার স্বজাতিরা ক্ষেপে গেছে। সুখিম্বার মরণ নেই। এটা যে সুখিম্বার কাজ নয় কে বলবে! ভয়ে ম্যান্ডেলার কেমন গলা কাঠ হয়ে গেছে। উড়ে গিয়ে খবর দিলে বুড়ো বাবা চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তার আগেই যদি মুম্বাটুকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফনের ঘোস্ট হাউজের সামনে হরিণ শুয়োর ঝলসানোর মতো ঝলসে নেয়! সে ইচ্ছে করলেই উড়ে যেতে পারছে না। আর যদি সত্যি সুখিম্বার মরণ না থাকে, তার ইচ্ছামৃত্যু হয়, তবে আর এক বিপদ। সুখিম্বা খাদে পড়ে গিয়ে মরে গেছে কিনা সে তাও ঠিক জানে না। তবে পাহাড়ের উপর থেকে গভীর খাদে পড়ে গেলে তো মরে যাবারই কথা মানুষের!

কিন্তু!

এই কিন্তুটাই হয়েছে ম্যান্ডেলার কাল।

সুখিম্বার ইচ্ছামৃত্যু!

সেটা কী!

সুখিম্বারা যখন বুড়ো হয়ে যায়, কী বোঝে কে জানে–উপজাতির লোকেরা এসে পরবর্তী সুখিম্বার নাম ঘোষণা করার কথা বলে। বুড়ো সুখিম্বা তার কোনো প্রিয়পাত্রকে ভার দিয়ে পাশের পাহাড়ে জঙ্গলে চলে যায়।

ম্যান্ডেলা জানে, হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মুম্বাটুর স্বজাতিরা পাহাড়ের উপত্যকায় ঘরবাড়ি বানায়। বসতির চারপাশে গাছের ডাল পুঁতে মাটি দিয়ে লেপে দেয়। গাঁয়ের ঠিক মাঝখানটায় একটা বড় উঠোন থাকে। সেখানে শুকনো বড় গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে রাখা হয় সারারাত। আগুন দেখলে বুনো হিংস্র প্রাণীরা পালায়।

সুখিম্বারা জানে, কোথায় কোন গুহায় ক'জোড়া সিংহ-সিংহী থাকে। তার স্বজাতিরা ঢাকঢোল পিটিয়ে পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে কোনো গুহার মধ্যে সুখিম্বাকে রেখে আসে। সঙ্গে একমাসের খাবার। জল এবং দুটো ভেড়া, একটা ছাগল। আর আগুনের মশাল। সুখিম্বা সেখানে সিংহের ফিরে আসার প্রত্যাশায় থাকে। জরাজীর্ণ শরীর। সে দেখতে পায় দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে হিংস্র শ্বাপদ। এবং সে তখন পূর্বপুরুষের আত্মাদের বলে, 'আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি না। উপজাতির মঙ্গলের জন্য এই সব হিংস্র বুনো প্রাণীর রক্তে মিশে যাচ্ছি।'

এমন সব গল্প শুনলে কে না অবাক হয়! ম্যান্ডেলাও অবাক হয়েছিল।

বুনো হিংস্র প্রাণীরা সুখিম্বার এভাবেই বশংবদ হয়ে থাকে। উপজাতিদের নিরাপত্তা এভাবে সে স্বেচ্ছামৃত্যুর সাহায্যে দিয়ে যায়। কেউ যদি সিংহের থাবায় মরে–কিংবা কারো গরু বাছুর যদি লোপাট হয়ে যায় চারণভূমি থেকে, তবে এটা যে সুখিম্বার প্রেতাত্মারই কাজ, মুম্বাটুর স্বজাতিরা এমন

বিশ্বাস করতে ভালবাসে। তাকে খুশি রাখা এজন্য খুব দরকার।

ম্যান্ডেলা বলেছিল, 'মিছে কথা!'

'আরে না। তুমি কিচ্ছু জান না! প্রেতাত্মাকে খুশি করার জন্য উপজাতিরা মাথা মুন্ডন করে।'

'কেন!'

'প্রায়শ্চিত্ত। কে কী পাপ করে ফেলেছে অজ্ঞাতে সেই ভয়ে।'

'সবাইকে মাথা মুন্ডন করতে হয়!'

'সব্বাইকে। তারপর ঘোস্ট হাউজে পুরোহিত করোটি হাতে নিয়ে একদিন একরাত নাচবে। যতক্ষণ না সংজ্ঞা হারাবে, নাচবে। নাচতে হবে। সংজ্ঞা হারাবার পর তার ঘোর লেগে যাবে। প্রেতাত্মা কী চায়, বলবে। সেইমতো কাজ না করলে ঘোর বিপদ।'

'ঘোর বিপদ!'

'হ্যাঁ, ঘোর বিপদ। কী বলবে, কাকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে, কার মেয়েকে আর মেষপালকের কাজ দেওয়া হবে না, চাষ-আবাদ কার বন্ধ করে দিতে হবে, সব সে বলবে। বললে পর সেইমতো কাজ হবে।'

সুতরাং সুখিম্বার আত্মাই তাদের তবে পিছু নিয়েছে। ঝোপের ভিতর বসে শলা-পরামর্শ করছিল মুম্বাটু। ম্যান্ডেলা কী করবে বুঝতে পারছে না। সে পকেট থেকে পালকের টুপি বের করে বলল, 'দেখে আসছি।'

'কী দেখে আসবে?'

'কারা তীর ছুঁড়ছে!'

আসলে ঘাসগুলি এত লম্বা যে তারা প্রায় চারপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আর কিছুটা যেতে পারলেই বুনো হাতির পাল যে রাস্তা ধরে যায় তা পেয়ে যাবে। সেখানে যেতে পারলে মুম্বাটু রাত কাটাবার মতো জায়গাও পেয়ে যেতে পারে। সে সঙ্গে রেখেছে বল্লম-তীর-ধনুক। সে ভীরু স্বভাবের নয়। একমাত্র গাববুন ভাইপারের আতঙ্কই তাকে এতক্ষণ কাবু করে রেখেছিল।

ঘাসের জঙ্গল শেষ হতে বোধহয় বেশি দেরিও নেই। কখন বিশ বাইশ গজ দূরে কিংবা একেবারে সামনে লেজের উপর খাড়া হয়ে গাববুন ভাইপার দুলতে থাকবে, ছোবল বসাবে, সেই আতঙ্কটা বোধহয় মুম্বাটুকে ম্রিয়মাণ করে রেখেছিল। তবে ম্যান্ডেলা বলেছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা অর্থাৎ হাইতিতি ঠিক কাছাকাছি কোনো বিপদ অপেক্ষা করলে আগে থেকেই টের পায়।

ম্যান্ডেলা টুপিটা পরতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বাতাসে বেলুনের মতো ভেসে যেতেই দেখল, কাছেই পাহাড়ের টিলা। সেখানে মশাল জ্বলছে। তীরগুলি ছুটে আসছে সেদিক থেকেই। ম্যান্ডেলা ঠিক বুঝতে পেরেছে, এরা সুখিম্বার অনুচর। পাহাড়ের মাথায় আগুন বাতাসে ভেসে যেতে দেখে এরাই পালাচ্ছিল।

সে দ্রুত সেদিকটায় গিয়ে দেখল, মাত্র দু'জন অনুচর—ওরা যে কী করে টের পেল ঘাসের জঙ্গলে তারা পালিয়ে আছে! অন্ধকারে তো কিছু বোঝার উপায় থাকে না!

যাই হোক, তার এখন বেশি ভাবনার সময় নেই। সে বুঝতে পেরেছে একমাত্র এ-দুজনই তাদের এতটা রাস্তা পিছু নিয়েছে। কারণ কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই। এ-দুটো লোককে ভয়ে দেখাতে না পারলে মুম্বাটুকে তার দেশ থেকে নিয়ে পালানো যাবে না।

ম্যান্ডেলা মশালটা হাতে তুলে নিতেই কেমন আতঙ্কে পড়ে গেল লোক দুটো। বল্লম তুলে তেড়ে এসে দেখল, মশাল আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে। সুখিম্বার সেই প্রেতাত্মার কাজ ভেবে তারা হঠাৎ মাটিতে শুয়ে মাথা ঠুকতে থাকল। তারা যে সুখিম্বার অনুগত, এটাই বোঝাতে চাইছে। ম্যান্ডেলা একটু বেশি উপরে উঠে গেলে নিচে কিছু দেখতে পেল না। কী করা দরকার সে বুঝতে পারছে না। আতঙ্কে পালাতে পারে ভেবে, আবার নেমে আসতেই দেখল, পালায়নি। লোক দুটো মাটিতে পড়ে আছে। বুক থাবড়াচ্ছে।

ম্যান্ডেলা বুঝল এই বনজঙ্গলে আগুনের খুব দরকার। লোক দুটোর চোখ-মুখ দেখে বুঝেছে—বিভীষিকা দেখলে মানুষের চোখ-মুখ এমন হয়। তা হতেই পারে। বাতাসে মশাল ভেসে যাচ্ছে, আবার মশাল নিচে নেমে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে মশাল, এমন ভৌতিক কান্ড যেই দেখুক, এমন কী ম্যান্ডেলা জানে তার দেশের লোক যে এত বেশি গীর্জায় যায়, যীশুর ভক্ত, তারাও বিষয়টা খুবই গোলমেলে ভাবত। আর এরা তো বনজঙ্গলের উপজাতি মানুষ। ছাগলের, গরুর দুধ খেয়ে বাঁচে। কার কটা গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল তাই দিয়ে গরীব বড়লোক ঠিক হয়। এরা তো ভড়কে যেতেই পারে।

সে আর দেরি করল না। আর তীরও ছুঁড়বে না। সে লোক দু'জনের ধনুক, বল্লম, তীর সব খুলে নিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। মুম্বাটুর জন্য নিয়ে গেলে পারত। সে জানে মুম্বাটু ওস্তাদ শিকারী। তার তাগড়াই শরীর এবং সে বালক বয়সেই সিংহের মুখে তীর ছুঁড়ে একটা বকনা বাছুরকে ছিনিয়ে এনেছে। তবে ওটা বাঁচেনি—কিন্তু তার বীরত্বের কাহিনী ছড়িয়ে পড়তেই সুখিম্বা বোধহয় প্রমাদ গুনেছিল। ফনের অসুখের অজুহাতে তাকে বিনাশের চেষ্টা করেছিল। দাও আগুনে পুড়িয়ে—যাক শত্রু পরে পরে।

সে মশালটা নিয়ে কিছুক্ষণ উড়ে বেড়াল ফনের রাজত্বে। এই দৃশ্য খুবই লোমহর্ষক উপজাতিদের কাছে। আগুনের গোলা আকাশে ছোটাছুটি করলে কার না আতঙ্ক হয়। সে শুনতে পাচ্ছে বড় বড় সব নাকড়া-টিকাড়া দুম দুম বাজছে। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খবর পৌঁছে দেবার এটাই রীতি। ম্যান্ডেলা বই পড়ে সব জেনেছে।

সে জানে উলডুভাই গিরিখাতে পৃথিবীর আদিমতম মানুষের বাস। তবে তা কত দূরে কোথায় সে জানে না। একবার যখন বাবাকে খুঁজতে এসে এমন একটা বনজঙ্গলের দেশ আবিষ্কার করে ফেলেছে তখন দু পাঁচ দিন এই অঞ্চলে উড়ে বেড়ালে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

তার বাবা সেই কবে জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। সে আজ চার-পাঁচ দিন হয়ে গেছে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। শহরের সবার কাছেই খবরটা একসময় পৌঁছে যেত। লুসির মেয়েটা আবার নিখোঁজ। একসময় তো তার মামা বুচার তোলপাড় করে বেড়াতেন। পুলিশ, মেয়র থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত গেছেন—ম্যান্ডেলা নিখোঁজ। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটাকেও খুঁজে

পাচ্ছে না। সে বাড়ি ফিরে গেলেই ধুন্দুমার কান্ড। মোটর সাইকেলে চেপে সার্জেন্ট, পুলিশের বড় কর্তা গাড়িতে, মেয়র পর্যন্ত একবার তাদের সেই নীলরঙের কাঠের বাড়িতে হাজির।

আর জেরা।

'কোথায় ছিলে!'

ম্যাণ্ডেলা চুপ।

'কোথায় গেছিলে।'

ম্যাণ্ডেলার এক কথা, 'বাবাকে খুঁজতে।'

'বাবাকে খুঁজতে গেছিলে ঠিক আছে–কিন্তু সেটা কোথায়?'

মা-র কান্নাকাটিতে তখন মামা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। ফিরলেই এক কথা, ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও। বুঝুক মজা। মামার একটাই ভয়, কোনো খারাপ লোকের পাল্লায় না আবার তাদের এমন সুন্দর মেয়েটা পড়ে যায়। যা দিনকাল! কাগজ খুললেই, নিখোঁজ তরুণ-তরুণীর ছবি। কোথায় যায়! কেন যে নিখোঁজ হয়ে যায়! আর সে তো মামার শত হম্বিতম্বিতেও বলতে পারে না, তার কাছে আছে আশ্চর্য এক পালকের টুপি। আছে রুপোর ঘন্টা। যাদুকর তাকে দিয়ে বলে গেছে, কেউ জানবে না, কাউকে বলবে না। বললেই আশ্চর্য টুপি তার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। এই টুপি যে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে কেউ জানে না। কেবল মুম্বাটু জানে। আর জানত সেই নির্জন দ্বীপের বুড়ো লোকটা। যে পালিয়েছিল দ্বীপে। যুদ্ধের বিভীষিকায় পাগল হয়ে নৌ-বাহিনীর জাহাজ থেকে লাফিয়ে সমুদ্র সাঁতরে দ্বীপে উঠে গেছিল। তারপর কত বছর চলে গেছে, সে ছিল যুবক, দ্বীপে থাকতে থাকতে বুড়ো হয়ে গেল–তার ধারণা পৃথিবীতে যুদ্ধ চলছে। তার দিনরাতের হিসাব

তেড়ে এসে দেখল মশাল আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে।

ছিল না। সে ক্রমে দ্বীপের গাছপালার মতো হয়ে গেছিল। একা মানুষ–কচ্ছপের ডিম খেয়ে বাঁচত। মধু সংগ্রহ করত জঙ্গল থেকে–পাখির এক ধরনের লালা থেকে তৈরি বাসা জলে ভিজিয়ে স্যুপ বানিয়ে খেত।

এসব কথা তো বইয়ে লেখা থাকে না। বুড়ো লোকটার খবরও কেউ রাখে না। পালকের টুপি না পেলে, সেই বুড়ো লোকটাকেও আবিষ্কার করতে পারত না। সে থাকত গাছের ডালে, পরত পাতার পোশাক–সে বিশ্বাসই করত না যুদ্ধ কখনও শেষ হয়!

বিশাল গাছের কান্ডে সে তার মেয়ের নাম নদীর নাম দেশের নাম বড় বড় অক্ষরে খোদাই করে রেখেছিল। তাকেও বলতে হয়েছে, 'তুমি ভয় পেও না। আমি ম্যান্ডেলা–আমার মামা বুচার। মা লুসি। আমি বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। আমার বাবার জাহাজ নিখোঁজ। কোনো দ্বীপ- টিপে যদি বাবা আটকা পড়ে থাকে!'

বুড়ো তো বিশ্বাসই করতে পারেনি–চারপাশে হাজার হাজার মাইলের সমুদ্র শুধু–ঝড়, কখনও নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। কোনো জাহাজ সে আজ পর্যন্ত দেখেনি দ্বীপের মাথায় দাঁড়িয়ে। এমন একটা ছোট্ট মেয়ে কিছুতেই দ্বীপে আসতে পারে না। আসা সম্ভব নয়। তাকে দেখেই বুড়ো ভয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল। বুড়ো মানুষ খামোকা ভয় পেলে খারাপ লাগে না। তাই সে বলেছিল, 'এই দ্যাখ, আছি। এই দ্যাখ, নেই। আমার কাছে আছে পালকের টুপি। যাদুকর দিয়েছে। মাথায় পরলে অদৃশ্য হয়ে যাই, পকেটে রেখে দিলে ফুলের মতো ফুটে থাকি। ভয় পাচ্ছ কেন! ইচ্ছা করলে যত দূরের দেশই হোক ঘুরে আসতে পারি।'

সে মাত্র দুজনকে বলেছে–পালকের টুপির এই বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। অবশ্য সে প্রতিবারই ভয় পেয়ে গেছে–বলা ঠিক হয়নি, যাদুকর রাগ করতে পারে। সে বলতে পারে, ম্যান্ডেলা এত করে বললাম, এমন গোপন সৌন্দর্যের কথা কাউকে বলতে হয় না। তুমি বলে দিলে! সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ। যদি টুপির ক্ষমতা যাদুকর হরণ করে নেয়–তবে সে যে মা-র কাছে ফিরতে পারবে না। পাইনের বনে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। বাবার জন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। সে একটা অগম্য অঞ্চলে আটকা পড়ে যাবে। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। চোখে জল। কী হবে তবে! আমি তো বুড়োমানুষ ভেবেই বলেছি। আমাকে ভয় পেলে খারাপ লাগে না!

তখনই সে দেখতে পায়–যাদুকর সামনে হাজির। পরনে নাগরাই জুতো, মাথায় পালকের টুপি। ভারতের রাজরাজড়া যে পোশাক পরেন–তেমনি পোশাক–আর কী সুন্দর দেখতে!

মুখে তার স্মিত হাসি।

'আরে কান্নার কী হলো!'

'আমি আর কাউকে বলব না। আপনাকে কথা দিচ্ছি যাদুকর বসন্তনিবাস। আমি ভুলে গেছিলাম।'

'ভুল তো মানুষই করে।'

'আমি আর ভুল করব না। টুপির ক্ষমতা হরণ করে নেবেন না। হরণ করে নিলে মা-র কাছে ফিরতে পারব না। বাবা নিখোঁজ। মা নেই কাছে, আমি বাঁচব কী করে–'বলেই আবার ফুঁপিয়ে কান্না।

নিষ্পাপ মানুষকে টুপির কথা বললে দোষ হয় না।

বুড়ো মানুষটা নিষ্পাপ! ভাবতেই তার কী আনন্দ হয়েছিল! সে দেখেছিল যাদুকর অদৃশ্য। সে টুপি পরে বলেছিল, 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ হানস্?'

বুড়ো মানুষটার নামও মনে পড়ছে তার।

'না দেখতে পাচ্ছি না।'

'বাতাসে ভেসে যাচ্ছি বুঝতে পারছ?'

'না।'

ম্যান্ডেলার ধড়ে প্রাণ এসে গেছিল। সে তাহলে এতদিনে দুজন নিষ্পাপ মানুষকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। হানস্ আর মুম্বাটু। মুম্বাটুকেও সে সব বলেছে। না বললে, মুম্বাটুও তাকে দেখে দৌড়ে পালাত।

ম্যান্ডেলার এই এক বদ অভ্যাস–একবার উড়তে শুরু করলে নিচে আর নামতে ইচ্ছে হয় না। ভেসে ভেসে চলে যেতে ইচ্ছে হয় কেবল। ছোট্ট একটুকরো ছেঁড়া মেঘের মতো সে ভেসে যায়।

বই-এ সে এ-দেশটা সম্পর্কে কত কিছু পড়েছে!

মাসাই উপজাতিদের কথা সে বই পড়ে জেনেছে।

কেনিয়া–তানজানিয়ার সীমান্ত এলাকাতেই আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়–মাউন্ট কিলিমানজারো।

তার ইচ্ছে আছে সেখানে একবার ঘুরে আসবে।

পূর্ব আফ্রিকার রিস্ট ভ্যালি–তার আদিগন্ত তৃণভূমির মধ্যে মাসাই উপজাতির বাস।

সেখানে নাকি দেবতাদের পাহাড়ও আছে।

বই পড়লে কত কিছু জানা যায়।

মামা তার কত রকমের যে বই এনে দেন! কেবল এক কথা। পড়, পড়ে দেখ। পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায়, আর কিছুতে সে-আনন্দ নেই। সারাদিন টি.ভি. খুলে বসে না থেকে পড়। যত পড়বে জ্ঞানের ভান্ডার বাড়বে। শয়তানের বাক্সটাকে আশকারা দেবে না। ওটা মগজের ঘিলু গলিয়ে দেয়। নাচ-গান সব নয়, বিজ্ঞাপনের মতো জীবন নয়। বই না পড়লে নিজেকে ঠিক বোঝা যায় না। কত খবর বই-এ আছে–মনের সঙ্গে দেখবে বই-এর ছবি, কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি আর তার গাছপালা মিলে তোমার মধ্যে একটি চারাগাছ পুঁতে দিয়েছে। গাছটা তোমার যত বড় হবে, তত জীবনে তুমি ছায়া পাবে। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

ম্যান্ডেলা মামাবাবুর বড় বড় কথা একসময় একদম পছন্দ করত না। পড়ার সময় হলেই ঘুম পেত। টি.ভি. খুলে দিলে, ঘুম কোথায় চলে যেত। সেই মামাবাবু বকে বকে তার টি.ভি. দেখার নেশা ছাড়িয়েছেন। কত বই এখন সে উপহার পায়। মামাবাবুর এবারকার বইটায় আফ্রিকা মহাদেশের বিচিত্র খবর পড়ে থ'।

ইস, যদি বইটা মামাবাবু তাকে না দিতেন তবে জানতেই পারত না, দেবতাদের পাহাড় কোথায়? মাসাই উপজাতিরা কী ভাষায় কথা বলে! জানতেই পারত না মাসাইরা যাযাবর। তারা চাষ করে না। মাটি হচ্ছে ঈশ্বরস্বরূপ। তারা দুধ খায়, আর পোষা গরু বাছুর মোষের মাংস হরিণের মাংস চিতাবাঘের মাংস ঝলসে খায়।

মাসাইদের কত রকমের রূপকথা আছে।

মামাবাবু সে-সব রূপকথার সুন্দর সুন্দর ছবিয়ালা বই তাকে উপহার দেন। তার ঘরে কত রকমের বই—কত বিচিত্র খবর বই-এ। আহা, তার সেই সুন্দর বই-এর ঘরটি যদি মুম্বাটুকে দেখাতে পারত!

তবে সে বুঝতে পারত পৃথিবী কত বড়।

বুঝতে পারত, সমুদ্রে হাজার হাজার দ্বীপ তিমি মাছের মতো ভেসে আছে।

দ্বীপে কত রকমের ফুল ফোটে, কত রকমের প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়, কত রকমের কচ্ছপ শীতের সকালে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে রোদ পোহায় কেউ জানেই না। ঝাঁকে ঝাঁকে চিংড়িমাছ হেঁটে বেড়ায় সমুদ্রের নোনা জলে। গভীর নীল জল, অনন্ত তার পরিধি, মুম্বাটু তার কোনো খবরই হয়তো রাখে না। বই না পড়লে কিছু কী জানা যায়! শুধু ইস্কুলের বই পড়লে হয়! তার কাছে ইস্কুলের বই-এর মতো হতকুচ্ছিত আর কিছু থাকতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে না।

ভাগ্যিস তার মামাবাবু ছিলেন।

ভাগ্যিস যাদুকর বসন্তনিবাস তাকে পালকের টুপি দিয়েছিল।

ভাগ্যিস বাবার জাহাজ নিখোঁজ।

না হলে মুম্বাটুকে তো তার স্বজাতিরা পুড়িয়ে মারতই। কেউ রক্ষা করতে পারত না। এমন সুন্দর একটি প্রাণ পৃথিবীর কোল থেকে অকালে ঝরে পড়ত। অসুস্থ ফনের নিরাময়ের জন্য কী সাংঘাতিক চক্রান্ত!

বই পড়েই তো জেনেছে দেবতা এনগাই-এর ছিল তিন ছেলে।

তিনজনকে তিনি তিনটি উপহার দিয়েছিলেন।

প্রথম ছেলেকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ আমার বয়স হয়েছে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। দেবতাদের পাহাড়ে চলে যাবার জন্য ডাক এসেছে। আমি চলে যাব। তোমরা কে কীভাবে জীবনধারণ করবে আমি বুঝতে পারছি না। বুড়ো হলে সবাইকে দেবতাদের পাহাড়ে চলে যেতে হয়, তোমরা নিশ্চয় জান। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের কিছু দিয়ে যেতে না পারলে খাবে কী! বাঁচবে কী করে!'

তারপরই তিনি বললেন, 'আমার কাছে তিনটি জিনিসই আছে উপহার দেবার মতো। কে কী নেবে জানতে হয়।'

কার কী মর্জি হবে দেবতা এনগাই জানেন না। মানুষের মর্জি তো! তার সব চাই। সে পেলে সব জোরজার করে নিতে চায়। বাদ-বিসম্বাদ তাঁর পছন্দ না। দেবতাদের পাহাড়ে চলে যাবার আগে তিন পুত্রকে তিনটি উপহার দিয়ে যেতে চান।

দেবতা এনগাই বললেন, 'যাকে যা দেব তা নিয়ে খুশি থাকতে হবে।'

তিন পুত্র ভেবে পায় না, বাবা তাদের কী দিতে চান। কী দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে চান।

তারা দেবতা এনগাই-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না। সামনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। আদিগন্ত শুধু ঝড়ো হাওয়ায় ঘাস দুলছে। দূরে কোথাও একপাল হায়েনা ভেসে যাচ্ছে। কোনো বাওবাব গাছের ডালে চিতাবাঘ ঘুমে কাতর। গ্রীষ্মকাল বলে পাহাড়ের উপর থেকে লাল ধূসর ধুলো উড়ে আসছে। গবাদি পশু ছাড়া দেবতা এনগাই-এর আর কোনো সম্বল নেই। পুত্ররা ভাবছে, সেই সবই তিনি বোধহয় ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি তো বলছেন, তাঁর কাছে আছে তিনটে উপহার।

ইস, ম্যাণ্ডেলা উবু হয়ে পড়ছে, আর ভাবছে, দেবতা এনগাই হয়তো তাঁর পুত্রদের কোনো পালকের টুপি, রুপোর ঘণ্টার মতো কিছু উপহার দিয়ে যাবেন। অথবা বাবা যেমন তার জন্য সিংহল থেকে কাঠের হাতি নিয়ে আসত, জাভা থেকে পাথরের পরী তেমন কিছু হয়তো ডেকে দেবে।

আর তখনই সে দেখল বই-এ লেখা আছে—দেবতা এনগাই-এর নির্দেশ।

তিনি তাঁর বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোমাকে দিলাম তীর-ধনুক। বনে মৃগয়া করে বাঁচবে। অকারণে প্রাণীহত্যা করবে না। প্রয়োজন ছাড়া হরিণ শিকার করবে না। তোমরা যেমন বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, তাদেরও বেঁচে থাকার নিরাপত্তা দিতে হবে। লক্ষ্যভেদী বাণ। অকারণ ছুঁড়লেই তীরের মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে।'

মেজ ছেলেকে বললেন, 'তুমি এই শাবলটা রাখ। চাষ-আবাদ করবে। শস্য বুনবে। ধরিত্রীকে সুজলা সুফলা করে তুলবে। চাষ-আবাদে জীবন ধন্য করবে। দেবতারা দেখে খুশি হবেন।'

তৃতীয় ছেলে অর্থাৎ ছোট পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে কী দিতে পারি!'

ছোট ছেলে তো! আদুরে একটু বেশি। সে বলল, 'আমার কিছু চাই না।' অভিমান আর কী! দাদাদের ভাল ভাল সব দিয়ে তার জন্য কী রেখেছে কে জানে!

দেবতা এনগাই হাসলেন। বললেন, 'তোমাকে যা দিয়ে যাব, তা যে কেউ পেলে খুশি হবে। মানুষ ঘর বাঁধে ঠিক, আবার মানুষের মধ্যেই আছে যাযাবরী জীবন! তার কেবল কোথাও বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। ঘরে বন্ধ হয়ে কে থাকতে ভালবাসে! ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। কত পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে যেতে পারবে। গিরিখাত ধরে চলে যাবে। গভীর জঙ্গলে গেরিলাদের দেশেও ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারবে। তুমি হবে বাধাবন্ধহীন মানুষ। তোমার ঘর নেই, বাড়ি নেই। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে গেলে বুঝতে পারবে কী আনন্দ এই যাযাবর জীবনে।'

বলে তিনি থামলেন।

তারপর বললেন, 'সাভান্না তৃণভূমি সবটাই তোমার। তুমি চাষ-আবাদ করতে পারবে না। বন্য হিংস্র জন্তুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা ছাড়া তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার থাকবে একপাল গবাদি পশু।'

তিনি বললেন, 'এই নাও চারণ লাঠি। যেখানে যতদূরেই যাও, যেখানেই ঘর বাঁধ, সঙ্গে রাখবে এই লাঠি। মাটি খুঁড়ে প্রকৃতির অনিষ্ট করবে না। গবাদি পশু নিয়ে যাবে চারণভূমিতে। তার দুধ খাবে। দরকারে তার গলা ফুটো করে তাজা রক্ত বের করবে। তোমার পরিবারের লোকেদের এই খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। আর সবচেয়ে পুষ্ট এবং প্রিয় জীবটিকে বর্ষা আগমনের হেতু দেবতার কাছে উৎসর্গ করবে। তার ঝলসানো মাংস খাবে।'

বলে দেবতা এনগাই তাঁর ছোট ছেলের হাতে তুলে দিলেন চারণ লাঠি। এনগাই চলে গেলেন দেবতাদের পাহাড়ে। তিন পুত্র চলে গেল তিন দিকে। তারাই আফ্রিকার উপজাতিদের পূর্বপুরুষ।

ছোট ছেলে নটরো কপই হচ্ছে মাসাইদের প্রথম পূর্বপুরুষ। মুম্বাটু মাসাই উপজাতির ছেলে যে নয় ম্যান্ডেলা এটা টের পেয়েছে! কারণ মাসাইরা বিশ্বাস করে মাটি হচ্ছে মা। অন্য অনেক আদিবাসীর কাছে যেমন অরণ্য হচ্ছে তাদের জননী, তেমনি মাসাইদের কাছে মাটি।

মুম্বাটুর উপজাতিরা চাষ-আবাদ জানে।

তারা তীর-ধনুকের ব্যবহার জানে।

মশাল জ্বালতে জানে।

তাদের সর্দারদের বলা হয় ফন।

তাদের গুণিনের নাম সুখিম্বা।

সুখিম্বার মৃত্যু নেই।

সে উড়তে উড়তে দেখছে সব কিছু। অন্ধকার তো, নিচের কিছুই দেখা যায় না!

সে বলল, 'পালকের টুপি, তুমি আমায় নিয়ে চল, সেই গিরিখাতে। মুম্বাটু যে বলল সুখিম্বারা মরে না। অত উঁচু থেকে পাহাড়ের খাদে পড়ে গেলে কেউ বাঁচে!'

তবু একবার দেখা দরকার।

তার হাতে মশাল। সেই আলোতে অন্ধকার গুহায় নেবে দেখল, হাত পা ছড়িয়ে সুখিম্বা পড়ে আছে। মাথা ফেটে গেছে। ইস, কী বীভৎস! দেখা যায় না। তবু যদি বেঁচে থাকে! কোনো সিংহের গুহা যদি হয়!

সে হেঁটে গেল। দু-পাশে পাথরের দেয়াল। খাড়া কতদূর উঠে গেছে—আন্দাজ করা কঠিন! কাছে-ভিতে কোনো সিংহের গুহা সে দেখতে পেল না। মশালের লাঠি দিয়ে প্রথমে ছুঁয়ে দেখল—না নড়ছে না। সে পাথর থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিল। শন কাঠির মতো দেখতে ঘাসগুলি। শন কাঠি নাকে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিল।

না, মরে গেছে।

চোখ স্থির। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আর কী চোখ! জবা ফুলের মতো লাল। হাতে-পায়ে উল্কি। মুখে সাদা চুন মাখা। মাথা ন্যাড়া। হাতে তামার বালা। লাল আলখাল্লায় কত সব জীবজন্তুর চামড়া সেলাই করা।

কী করে যে মুম্বাটুকে বিশ্বাস করাবে, ভয় নেই। সুখিম্বা মরে গেছে। তার প্রেতাত্মা তোমাকে অনুসরণ করছে না। অযথা ভয় পাচ্ছ। সুখিম্বার ইচ্ছামৃত্যু, তার আত্মা সব উজবুকেরা বিশ্বাস করে।

তবু সে ভাবল সুখিম্বার আলখাল্লা খুলে নিয়ে যেতে পারলে মুম্বাটু টের পাবে, সুখিম্বার চেয়ে সে বেশি শক্তির অধিকারী। সুখিম্বার এই জোব্বা কেউ কখনও সিংহের গুহা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কেউ কেউ চেষ্টা করেছে, তাকে মরতে হয়েছে সিংহের হাতে। ফনের বিশ্বাস, যেই আনতে পারবে সেই হবে পরবর্তী ফন। ফনের মৃত্যুর পর সেই হবে উপজাতির সর্দার।

সর্দারের বাড়ির লোকেরা হবে তার সম্পত্তি।

সর্দারের চাষ-আবাদের জমি সে সব পাবে।

সর্দারের গবাদি পশুর সে মালিক হবে।

প্রধান পুরোহিত নির্বাচনের অধিকার থাকবে তার।

এ-সব খবর মুম্বাটুই তাকে দিয়েছে।

যা অবস্থা তাতে ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে বুড়ো বাবার দেশে যাওয়া খুব কঠিন। এখন বর্ষার সময়। ঝোপ-জঙ্গল নিবিড়—সবুজ হয়ে আছে অরণ্য।

নানা চিন্তা মাথায়।

যাই হোক, সে সুখিম্বার শরীর থেকে আলখাল্লা খুলে আবার উড়তে থাকল।

কোনো মৃত ব্যক্তির পোশাক নিয়ে উড়তে কার ভাল লাগে! তার বেশ ঘেন্না হচ্ছে। কোনোরকমে আলগা করে এক হাতে রেখেছে। আর এক হাতে মশাল।

আগুনের গোলা আকাশে ওড়াউড়ি করলে, কে আছে, না ডরায়!

ম্যান্ডেলা দেখতে পেল পাহাড়ের উপত্যকার সব গ্রামগুলিতে ঘরে ঘরে মশাল জ্বলে উঠেছে। তারা গাঁয়ের বাইরে এসে জড় হয়েছে মনে হলো।

সে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় দেখল, একই ভাবে কালো মানুষগুলি চিত হয়ে বুক থাবড়ে যাচ্ছে। এটা বোধহয় কোনো অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করার রীতি। আর হাউমাউ করে হল্লা করছে। গরু বাছুর মুরগি জবাই করছে। আগুন জ্বালিয়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে একদল প্রায়-উলঙ্গ কালো পুরুষ নারী।

সে মজা পাচ্ছিল।

সে বুঝতে পেরেছে যদি কোনোরকমে ওদের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দিতে পারে, সুখিম্বাই সব নয়, তার চেয়ে বড় কেউ আরও শক্তিমান অপদেবতা আছে তবে মুম্বাটুর জীবন রক্ষার কাজ খুব কঠিন হবে না।

একবার নামবে নাকি!

আরে ঐ তো ফনের সেই বিশাল ক্রাল। দুর্গের মতো চারপাশে কাঠের থামে মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়াল তোলা। খড়ের ছাউনি দেওয়া বিশাল বিশাল মাটির ঘর। এরই কোনো ঘরে ফন হয়তো মৃত্যুশয্যায়।

সে ফনের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শুধু কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে। হাতে বর্শা। হাঁটুর কাছে পালকের কারুকাজ। কোমরে সজারু কাঁটার ঝালর। মুখে নানা বর্ণের মুখোশ আঁটা। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে ঘরগুলোর উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে—আর তা দেখে যে যার বর্শা নিয়ে ছুটছে। কেউ আগুনের গোলা দেখে বর্শা ছুঁড়ছে না। অপদেবতা এসে গেছে ফনের রাজত্বে, কারো রক্ষা নেই। মশালের আলোতেই সে যতটা পারছে দেখে নিচ্ছে। হৈ-হল্লা, চিৎকার-চেঁচামেচি। সে দেখছে দলে দলে সব উপজাতিরা জঙ্গলের দিকে আশ্রয়ের জন্য নেমে যাচ্ছে।

না, তার এ-সব ভাল লাগছে না। তার আগুনের গোলা দেখে সবাই পালাচ্ছে বুঝতে পেরেই ভাবল, অকারণ এই সব সরল অকপট মানুষকে ভয় পাইয়ে লাভ নেই। সরল অকপট মানুষের নানা সংস্কার থাকে। সে এখানে এসে এটা বুঝেছে।

যেমন বুড়ো বাবাকে দেখে বুঝেছে, তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে যীশুর করুণার খবর পৌঁছে না দিলে মানুষের মুক্তি ঘটবে না এমন

ভাবেন। এটা তাঁরও জীবনের সবচেয়ে জরুরী কাজ। নতুবা এমন জংগলের রাজ্যে একজন সাদা মানুষ বছরের পর বছর থাকে কী করে! কে আছে তাঁর কিছু বলেন না। করুণাময় যীশু ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই এমনই তিনি বলেন। ভাল মানুষদের এই স্বভাব। যা বিশ্বাস করবে অকপটে বিশ্বাস করবে।

ফনের রাজত্বের মানুষেরাও ভাল মানুষ।

সে তো বই-এ পড়েছে, তারা নরমুন্ড শিকার করতে ভালবাসে। মানুষের মাংস ঝলসে খায়। মুম্বাটুকে পুড়িয়ে কী তার ঝলসানো মাংস ভোগ প্রসাদ পাতে দেওয়া হতো! কী জানি। আর মুম্বাটুও হয়েছে তেমনি! সে বিশ্বাসই করতে পারে না, সুখিম্বার প্রেতাত্মার হাত থেকে সে কখনও রক্ষা পাবে!

ম্যাণ্ডেলা যে তাকে বধ্যভূমি থেকে নিয়ে এসে ভাল কাজ করেনি তাও মুম্বাটু কথায় কথায় বলেছে। বলেছে, 'ম্যাণ্ডেলা, তুমি আমাকে সেখানেই রেখে এস, আমার জীবন আর নিরাপদ নয়।' এই যে আলখাল্লা নিয়ে যাচ্ছে, দেখলে না আবার ভয়ে পালায়! যা গভীর বনজংগল, পালালে খুঁজবে কোথায়! পালকের টুপিরও তো ক্ষমতার একটা সীমা আছে। যে হারিয়ে যেতে চায়, কিংবা পালিয়ে যেতে চায় তাকে ধরে আনার সাধ্য টুপির নাও থাকতে পারে। সে তো এমন ঘটনার সামনে কোনোদিন পড়েনি।

টুপিরও ক্ষমতার সীমা আছে। তবে যে পালিয়ে থাকতে চায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পালকের টুপিকে বললেই তো হয়ে যায়—আমাকে আমার নিখোঁজ বাবার কাছে নিয়ে যাও। তবে আর এতদিন থেকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন! বাবাও কি তার তবে পালিয়ে বাঁচতে চায়? দেশে ফিরতে চায় না? কোথাও কোনো দ্বীপে বুড়ো হানসের মতো যদি বেঁচে থাকতে চায়? হয়তো দ্বীপের গাছপালার সংগে, জীবজন্তুর সংগে বাবার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে—দেশে আর ফিরতে চায় না।

যেই না ভাবা সংগে সংগে তার চোখে জল এসে গেল।

তার কথা মনে হলে বাবা কিছুতেই স্থির থাকতে পারত না। যে করেই হোক দেশে ফিরে আসত। মা-র কথা মনে হলেও বাবা স্থির থাকতে পারত না। আসলে কী বাবার জাহাজডুবি হয়েছে, না কোনো চড়ায় আটকে গেছে জাহাজ—কিংবা এমনও তো হতে পারে ঝড়ে-ঝাপটায় জাহাজের ভারি কিছু বাবার মাথায় ভেঙে পড়েছিল। বাবার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। কাউকে কিছু বলতে পারছে না।

সে আর ভাবতে পারছে না।

সে বের হবার সময় বলে, 'পালকের টুপি, আমার বাবার জন্য মন খারাপ করছে। কিছু ভাল লাগছে না।' তখনই তো সে ভাসতে ভাসতে চলে যায়—কত দূরদেশে—এমন তো দেশ নেই যেখানে সে যেতে পারে না! আসলে তার মনের মধ্যে কখন যে কী সংশয় দেখা দেয় নিজেও বোঝে না। কেন যে সংশয় দেখা দিল মুম্বাটু পালিয়ে গেলে তাকে আর খুঁজে পাবে না!

কখনও কেউ তো পালায়নি, যে সে জানবে, পালালে খুঁজে পাওয়া যায় না। অকারণ কত যে দুশ্চিন্তা হয় বাবার জন্য। বাবা যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক। সে তার বাবাকে সারাজীবন খুঁজবে। আর মনে হয় খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাবে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট—পাইন ফ্যাস্টিভ্যালে সে আর বাবার হাত ধরে যেতে পারে না। মেলা হয়, মেলায় তাকে নিয়ে যেত বাবা, মা সংগে থাকত। কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বসত। তারপর ঘোড়া ফেলে কেবল তাকে পিঠে নিয়ে ঘুরত। সে অবশ্য এখন মামাবাবুর সংগে যায়। বাবার সংগে যাওয়া আর মামাবাবুর সংগে যাওয়া কী কখনও এক হয়! বড়দিন এলেই কান্না পায়। বাবা তাকে হাত ধরে গীর্জায় নিয়ে যেত। সেই বাবাকে খুঁজতে এসে কতরকম অভিজ্ঞতা যে তার হচ্ছে!

সে এবার ভেসে যাচ্ছে ঘাসের মাঠ পার হয়ে—এদিকটাতেই মুম্বাটুকে সে রেখে গেছে। হাইতিতিও সংগে আছে। তবে হাইতিতি ঠিক টের পাবে সে ফিরছে।

তার তখনই মনে হলো সারাদিন সে কিছু খায়নি।

মুম্বাটু কিছু খায়নি।

হাইতিতি নিজের খাবার ঠিক খুঁজে-পেতে বের করে। ইস, তার মনেই ছিল না সে সারাদিন খায়নি।

সংগে সংগে দেখল, পাশে ঘণ্টা বাজছে। হাইতিতি হাজির।

এক ধমক, মুম্বাটুকে একা ফেলে চলে এলি!

হাইতিতির ভাষা ম্যাণ্ডেলা ঠিক বোঝে। হোক না ক্যাংগারুর বাচ্চা, তার পা আর লেজ নাড়ার ভংগী থেকেই সে টের পায় কী বলতে চায় হাইতিতি।

'কোথায় আছে মুম্বাটু!'

'ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে।'

আরে তাই তো।

মুম্বাটু ঘাসের জংগল থেকে উঠে এসেছে। ঘাসের জংগলেই বেশি ভয়। বেড়ালের মতো সতর্কতা নিয়ে সিংহ বিচরণ করে বেড়ায়। তবে মুম্বাটু বলেছে, তার ঘ্রাণশক্তি প্রবল—এক দু-ক্রোশের মধ্যে কোনো সিংহ শিকারের সন্ধানে বের হলে গন্ধে সে টের পায় বের হয়েছেন তেনারা। সে তার বর্শা বাগিয়ে গাছের আড়ালে বসে পড়ে। মুম্বাটু ভয় পায় শুধু সেই ভয়ংকর ভাইপার সাপকে। ফণা উঁচু করে দাঁড়ায়। ঘাসের ডগায় মাথা জেগে থাকে। আর শিস দেয়। শিস শুনলে মনে হবে, কোনো নির্জন প্রান্তরে বসে কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে।

জায়গাটা মুম্বাটু ভালই পছন্দ করেছে। একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট পাথরের মসৃণ উপত্যকা। এখন যা মুশকিল, সুখিম্বার জোব্বা। জোব্বা দেখলে যদি পালায়। ওকে প্রথমে খবর দিতে হবে সুখিম্বা বেঁচে নেই। ধীরে ধীরে তাকে সুখিম্বার প্রেতাত্মার ভয় দূর করতে হবে। একবারে পারা যাবে না। গিয়েও দেখানো যাবে না, এই দ্যাখ, বিশ্বাস হচ্ছে না—দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ। তুমি তো জান, এটা পরেই সুখিম্বা আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী বকছিল। তোমার স্বজাতিরা নাচছিল, বাদ্যকার বাদ্য বাজাচ্ছিল! কী মনে পড়ছে! ঘোর কাটেনি তোমার!

এখন দরকার এক পেট খাওয়া। যদি মুম্বাটুর এখনও ঘোর থেকে থাকে—তা দূর করা। সে নিচে নেমে একটা পাথরের আড়ালে সুখিম্বার জোব্বা লুকিয়ে রাখল।

প্রথমেই ত্রাসে ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না মুম্বাটুকে।

আগুনের গোলা নেমে আসতেই মুম্বাটু দৌড়ে গেল।

কিশোর বালক। পাথরে খোদাই শরীর। সারাদিন সেও কিছু খায়নি। গোলাটা যে একটা মশাল, ম্যান্ডেলা টুপি রেখে দিতেই মুম্বাটু টের পেল।

আসলে মুম্বাটুর প্রায় যেন হুঁশ ছিল না। সে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল ঠিক, কখন যে ঘুমে ঢুলছিল টের পায়নি। বেশ ঠান্ডা হাওয়া ঘাসের বন থেকে উঠে আসছিল। সারাদিন তার যা গেছে! সুখিম্বার ঘোষণার পর থেকেই তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। তবে উপজাতির মঙ্গল হবে, ফন ভাল হয়ে যাবেন ভেবে সে খুব বিচলিতবোধ করেনি। বরং প্রাণরক্ষা হবার পরই বেশি বিচলিত। তবু শরীর তো। কতক্ষণ আর সহ্য করবে!

মশালটা হাতে নিয়ে ম্যান্ডেলা দাঁড়িয়ে পড়তেই সে দৌড়ে গেল। বলল, 'কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে! হাইতিতিও নেই।'

ম্যান্ডেলা বলতে পারত, তুমি তো বিশ্বাস করবে না—কী যে করি! আরে কারো কোনোদিন ইচ্ছামৃত্যু হয়! সে তো আত্মহত্যা যারা করে তারা বলতে পারে ইচ্ছামৃত্যু। তোমাদের সুখিম্বা কখনও কী চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে! কেউ বাঁচে না—সুখিম্বা বাঁচবে! তা হলেই হয়েছে।

যাই হোক, এখন এ-সব বলে লাভ নেই। সে বলল, 'কিছু শুকনো কাঠ দরকার মুম্বাটু। আগুন জ্বালতে হবে।'

ম্যান্ডেলা যে কী ঠিক বুঝতে পারছে না মুম্বাটু। এখন তো মানবী। ঠিক একটা বাচ্চা মেয়ের মতোও কথা বলছে না। আগুন জ্বেলে না রাখলে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে না, ছোট্ট মেয়েটাও বোঝে।

ম্যান্ডেলা বলল, 'খিদে পেয়েছে। কী করা যায় বল তো! এত রাতে কোথায় খাবার পাওয়া যেতে পারে—আর দোকানপাট সব বন্ধ। দিনের বেলায় হলে যে করেই হোক, উড়ে গিয়ে বাজারে নেমে ভেলকি দেখালেই চোঁ দৌড়।' কিন্তু এত রাতে তো কেউ জেগে নেই যে ভেলকি দেখাবে। অথচ খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

মুম্বাটুরও মনে পড়ল সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। খাওয়ার নিয়মও নয়। তাকে সকাল থেকে বিচিত্র সব গিরিমাটির রঙে সাজানো হয়েছিল। শরীরে এমনিতে হাতে-পায়ে উল্কি আঁকা আছে—ফুলফল প্রজাপতি আঁকা আছে, মুখে বিচিত্র সব রঙ ডোরাকাটা বাঘের মতো—ঘামে ভিজে সব একাকার। রাস্তায় সে পাতা ছিঁড়ে মুখ মুছে নিয়েছে। হাতে-পায়ে এখনও কোথাও কিছু রঙ লেগে আছে। ঘাসের বন থেকে উঠে আসার সময় হাতে-পায়ে-পিঠে ধারালো ঘাসের পাতা ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ম্যান্ডেলার ফ্রক গায়ে। পায়ে জুতো, মোজা নীল রঙের—মাথায় টুপি, ধারালো পাতা তার শরীরে বিশেষ ক্ষতি করেনি। তার তো উদোম গা—সে জানে কী লাগালে ক্ষত নিরাময় হয়ে যায়। পাথরের সবুজ শ্যাওলা সারা গায়ে মেখে বসেছিল—এখন আর পিঠে-গায়ে কোথাও যন্ত্রণাবোধ করছে না। কেবল খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

সে বলল, 'বোস। আমি আসছি।'

'কোথায় যাবে!'

'আগে ঘাসপাতায় আগুন জ্বালি। কোথা থেকে কে উঠে আসবে! আগুন জ্বেলে রাখলে হিংস্র প্রাণীরা পালাবে। আগুনকে বড় ভয় পায়।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'যাবেটা কোথায়!'

মুম্বাটু কথা বলছে না। পাহাড়ের ঢালুতেই আছে ট্যুরাসো পাখি। নিশুতি রাতে তারা গাছের ডালে ঘুমায়। পাহাড়ের খোঁদলে ডিম পেড়ে রাখে।

সে বলল, 'এই আসছি। আগুন জ্বেলে দিয়ে গেলাম।' বলেই মশাল হাতে নিচে নেমে যেতেই দেখল সামনে অ্যাকাসিয়া গাছের বন। কিছুক্ষণ পর শুধু মশালটাই দেখা গেল—তারপর মশালটা গাছের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় তাও দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় যাচ্ছে! ইস, কী খিদে। আর ও কিনা মশালটা নিয়ে নেমে গেল, এত রাগ হচ্ছিল মুম্বাটুর উপর। নিজেই বলেছে স্বজাতিরা তাকে অনুসরণ করবে। পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে উৎসর্গ করতে না পারলে তার স্বজাতিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুখিম্বা পর্যন্ত পরাজিত—কোনো অপদেবতা ভর করেছে বলেই মুম্বাটু পালিয়ে যেতে পেরেছে! আর কিনা সেই এখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল! কী সাহস! কী দুর্জয় সাহস!

শরীরও আর দিচ্ছে না। এখন কেবল পড়ে পড়ে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। সকাল না হলে কিছু করাও যাচ্ছে না। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু কালো গভীর অন্ধকার—আকাশে অজস্র নক্ষত্র—আর এ সময় দেখা গেল জঙ্গলের ফাঁকে আকাশের গায়ে ভাঙা চাঁদ উঠে আসছে। কী যে সুন্দর লাগছে! গভীর অরণ্যে এ-ভাবে চাঁদ উঠে আসে, আগে সে জানতই না। সমুদ্রের বুকে চাঁদ উঠে আসছে, সে বাড়ি থাকলে দেখতে পায়—দেখতে পায় কখনও সেই চাঁদ তাদের প্রিয় এগমন্টা পাহাড়ের ছায়ায় নেমে যাচ্ছে। পাইনের বনে ঘোরার সময় রাতে চাঁদ উঠতে দেখেছে—কিন্তু অ্যাকাসিয়া গাছের জঙ্গলের চাঁদ ওঠা যে না দেখেছে, বুঝবেই না পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কত মজার!

আর তখনই মনে হলো মশালের আলো নিয়ে কে উঠে আসছে।

মুম্বাটুই হবে।

এত গভীর জঙ্গলে কেউ ঢুকে যেতে পারে এত রাতে সে বিশ্বাস করতে পারে না। তবু ভয় তো, অচেনা জায়গা—আসছি বলে মুম্বাটু কোথায় চলে গেল, যদি মুম্বাটুর স্বজাতিরা দল বেঁধে চুপিসাড়ে উঠে আসে—টের পায় মুম্বাটু এখানে লুকিয়ে আছে—অজানা দেশ, অচেনা সব গাছপালা—অজ্ঞাত সব জীবজন্তুর আচরণ—মাথার উপর এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিতে সে রাজী না। কাছে এলেই মাথায় টুপিটা পরে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য। হাইতিতির গলায় ঘন্টা বেঁধে দেবে—সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য। কিন্তু মুম্বাটু যখন ফিরে আসবে—তখন তো তাকে রক্ষা করা খুবই কঠিন—এ-সব ভাববার সময়ই দেখল, মুম্বাটু উঠে আসছে। পিঠে বিশাল পাতার ঠোঙা সাজানো। আরে এ-সব কী নিয়ে এসেছে!

সে দৌড়ে নিচে নেমে গেল।

কাছে যেতেই মুম্বাটু ওর হাতে কী দিয়ে বলল, 'ধর।'

পাতার বিশাল ঠোঙায় গোটা বিশেক ডিম। পিঠে ঝোলানো বুনো লতার শিকে নামিয়ে দুজনে হাঁটতে থাকলে, ম্যান্ডেলা বলল, 'ওতে কী আছে!'

মুম্বাটু বলল, 'মধু আছে।'

'মধু!'

মধু ম্যান্ডেলার খুব প্রিয়। তার দেশে মধু পাওয়া যায় কিনা জানে না–তবে বাবা তাকে কত কিছু এনে খাইয়েছে, মধু কখনও খাওয়ায়নি। হানস্ যে দ্বীপটায় থাকত, সেখানে সে প্রথম মধুর খোঁজ পায়। বন্য মানুষদের এটি একটি প্রিয় খাবার। হানস্ তো দ্বীপে থাকতে থাকতে বন্য মানুষ হয়ে গেছিল। সে তার গাঁয়ের নাম, মেয়ের নাম, নদীর নাম ভুলে যেতে পারে ভেবেই তো গাছের কান্ডে লিখে রেখেছিল। সে মরে গেলে–যদি কেউ কখনও দ্বীপে আসে, তবে শুধু গাছটাই দেখতে পাবে–মানুষটাকে দেখতে পাবে না। সে তো দ্বীপে থাকতে থাকতে একটা পাথর হয়ে গেছিল।

জাহাজের কাপ্তান খোঁজাখুঁজি করেছে হানস্কে। খুঁজে পায়নি। ম্যান্ডেলাই কাপ্তানের স্যুপের প্লেট মুখের কাছ থেকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। তারপর মাস্তুলের ডগায় বসে নিজেই স্যুপটা খেয়ে ফেললে। জাহাজে ছোটাছুটি, গন্ডগোল, কাপ্তান দৃশ্যটা চোখের উপর দেখে হজম করতে পারেনি। কে পারে! খেতে বসে যদি দ্যাখে টেবিল থেকে স্যুপের বাটি উড়ে যাচ্ছে, কার এমন শক্ত ঘিলু আছে ঠিক থাকতে পারে! সংজ্ঞা হারিয়েছিল কাপ্তান। জাহাজে তো ভূতের উপদ্রব থাকেই। যখন ভয়ে সবাই বিবর্ণ, ম্যান্ডেলা মাস্তুলে বসে বলেছিল, 'জাহাজ পশ্চিমে নিয়ে যাও'–তারপর বলেছিল–'ওখানে এক নির্জন দ্বীপে একজন পলাতক সৈনিককে দেখতে পাবে। সে বুড়ো হয়ে গেছে দ্বীপে থাকতে থাকতে। তার ধারণা যুদ্ধ শেষ হয়নি। দ্বীপটা খুবই ছোট। পাথরের দেয়াল আছে–দেয়াল পার হয়ে গেলে বিশাল একটা গাছ দেখতে পাবে–হানস্ ওটো ওখানে থাকে। গাছের কান্ডে তার দেশের নাম, নদীর নাম, গাঁয়ের নাম, মেয়ের নাম লিখে রেখেছে। তাকে জাহাজে দেশে পৌঁছে দিলেই, স্যুপের বাটি উড়বে না, মাথার টুপি ভেসে যাবে না, রঙের টব সমুদ্রে দোল খাবে না। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

ম্যান্ডেলা পরে খবর পেয়েছিল, না দ্বীপে কেউ নেই। কাপ্তান জাহাজটা নিয়ে দ্বীপটায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। মানুষের মতো কেউ ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, তবে মানুষ না। হাজার হাজার প্রজাপতি মানুষটার গায়ে বসে আছে। পাথরের মতো একটা অপ্রাকৃত জীব হয়ে গেছে সে। ম্যান্ডেলা গেছিল। সেও দেখেছে। ওটা একটা পাথরেরই মূর্তি। মানুষের মতো অবয়ব ঠিক–তবে প্রজাপতিরা সেই মূর্তির উপর বসে এমনভাবে ঢেকে রেখেছিল যে ডাকতে পর্যন্ত সাহস হয়নি–তুমি কী হানস্ ওটো? তোমাকে কী প্রজাপতিরা লুকিয়ে রেখেছে–দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে বলে, তারা আড়াল করে রেখেছে তোমাকে!

দ্বীপের সেই হানস্ ওটোই তাকে প্রথম মধু খাবার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়েছিল।

'হাত পাত।'

সে হাত পেতেছিল।

একটা কচ্ছপের খোল থেকে সাদা বরফের মতো একখন্ড বস্তু তুলে দু-আঙুলে টিপে দিতেই হাতের তালুতে ফোঁটা ফোঁটা রস।

হানস্ বলেছিল, 'চেটে চেটে খাও।'

ইস কী সুস্বাদু! ম্যান্ডেলা চেটে চেটে খাবার সময় বলেছিল, 'তোমার হাতে ওটা কী?

'মোম।' মধুটুকু তুমি খেলে। মোমটুকু রেখে দেব। এতে আগুন জ্বালানো যায়।

'আর একটু দাও।'

আবার টুকরো করা বরফখন্ডের মতো মধুর চাক তুলে তার হাতে দিয়েছিল। টিপে দিতেই ফোঁটা ফোঁটা রস। হানস্ বুড়ো মানুষ, কত খবর রাখে দ্বীপের। সেই বলেছিল, দু গন্ডুষ মধু খেলে সারাদিন আর কিছু না খেলেও চলে! মুম্বাটু আবার সেই মধু নিয়ে এসেছে।

আনন্দে সে হাততালি দিয়ে বলল, 'আমি জানি, মধু খেতে আমি জানি। আমি মধু খেয়েছি। কিন্তু ডিমগুলি দিয়ে কীভাবে কী করা যাবে!'

মুম্বাটুকে এখন বালক বলে মনে হয় না। সে যেন সংসারী মানুষ। পিঠ থেকে আবার একটা কী নামাল। পরিত্যক্ত লাউ-এর খোল। তার ভিতর সে জলও নিয়ে এসেছে। না ভাবা যায় না! মুম্বাটুর ঘোর কেটে গেছে। না হলে এত যত্ন করে ম্যান্ডেলার জন্য সব কিছু সাজিয়ে আনত না।

মুম্বাটু হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'আরে করছ কী, ঘাস পাতা দাও। আগুন তো নিভে যাচ্ছে।'

তা ঠিক, তার আগুনের প্রতি নজর ছিল না। মধুর লোভে তার জিভে জল এসে গেছে। কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। অ্যাকাসিয়া গাছের পাতা ঝরছে। সেই পাতার খসখস শব্দ পর্যন্ত উঠছিল। গাছের মরা ডাল এনে জমা করেছিল–দু'একটা মরা ডালও আগুনে ফেলে দেওয়া হলো। আগুনের দীপ্তিতে তিনজনের মুখ ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

হাইতিতি বসে আছে দু-পায়ে ভর দিয়ে।

ম্যান্ডেলা মধুর ভান্ড উঁকি দিয়ে দেখছে।

মুম্বাটু ডিমগুলি আগুনে সেঁকে নিচ্ছে।

তারপর সে বুনো লতায় মোড়া পদ্মপাতার মতো দেখতে বিশাল পাতার একটা পাতা রেখে বাকি সব কটা পাতা হাইতিতির দিকে এগিয়ে দিল।

হাইতিতি পরম তৃপ্তির সঙ্গে পাতাগুলি খাচ্ছে।

মুম্বাটু জঙ্গলের মানুষ, সে জানতেই পারে কোন প্রাণী কী খেতে ভালবাসে, কিংবা তাদের গবাদি পশুর জন্য যে সব ঘাস বিচালি দরকার পড়ে, বলা যায় না এইসব পাতা কুচি করে মিশিয়ে দেবার নিয়ম।

যাই হোক, ম্যান্ডেলা দেখল পাতার একটা ঠোঙা মুম্বাটু তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

ডিমগুলোর খোসা ছাড়িয়ে পাতার উপর রাখা হয়েছে।

ম্যান্ডেলার ঠোঙায় মধু ঢেলে দিয়ে ডিমগুলি দু-ভাগ করে একটা ভাগ তাকে দিলে, সে বুঝতে পারল না কী করবে!

মুম্বাটু মধুতে ডিম চুবিয়ে খাচ্ছে।

ম্যান্ডেলা শুধু তাকিয়ে দেখছে।

'আরে তাকিয়ে দেখছ কেন! খাও। কত রাত হলো। রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে হবে। একটু ঘুমিয়ে না নিলে শরীর দেবে কেন! ক্রস নদী পার হতে দু-দিন লেগে যাবে।'

ম্যান্ডেলা মধুতে ডিম চুবিয়ে খেতেই বুঝল, বড়ই সুস্বাদু খাবার।

চারপাশে অগণিত গাছপালা, নিচে ঘাসের বন, সামনে

আগুন জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় গাছগুলো কী নিথর! কোনো হাওয়া নেই। গরমও নেই। শীত শীত লাগছে। আগুনের এই উত্তাপ এখন তাদের বেঁচে থাকার জন্যও খুব দরকার।

এভাবে আগুনের পাশে বসে মধুতে ডিম চুবিয়ে খাওয়া কী যে মনোরম! ম্যান্ডেলা খাচ্ছে আর ভাবছে, কী করে মুম্বাটুকে বুড়ো বাবার কাছে যে পৌঁছে দেবে! যদি তার স্বজাতিরা তাকে গ্রহণ না করে তবে তো বুড়ো বাবার এলাকায় যেতে না পারলে মুম্বাটুর নিস্তার নেই। কিন্তু একবার তার দাদুকে না দেখিয়ে নিয়ে গেলে বুড়োর মন খারাপ হয়ে যাবে। কী যে করে!

খুব বেশি ভেবে লাভ নেই, এতে মন খারাপ হয়ে যায়। এমন সুন্দর ভোজনপর্ব তবে মাটি! না ঘুমালে শরীর দেবে না। হাইতিতি মাথা পাথরে রেখে পোষা কুকুরের মতো ঘুমিয়ে আছে। মুম্বাটু শোবার সময়ও কথা বলছিল—'পাথরে কষ্ট হবে ম্যান্ডেলা। দাঁড়াও।' বলে ঘাসের আঁটি বেঁধে শিয়রে দিয়ে দিল। বালিশের মতো কাজ করছে ঘাসের আঁটি। বড় বড় সব কাঠ গড়িয়ে এনে রাখল পাশে। সারারাত যাতে আগুন জ্বলে তার ব্যবস্থা। মশালটা মাথার কাছে পাথরের খোঁদলে সেঁটে দিয়ে বলল, 'যাক আর ভয় নেই। বুনো জানোয়ার তাড়া করতে পারবে না।'

তারপরও মুম্বাটু কথা বলছিল। তার উপজাতিদের কথা। সুখিম্বার কথা। তার পূর্বপুরুষদের আত্মাদের কথা। মা-বাবার কথা।

মুম্বাটু পাশ ফিরে শুলো, 'জান সুখিম্বা মরে গেলেও আমার স্বজাতিরা ভাবে মরেনি। সে ঘুমিয়ে আছে ভাবে। তখন তাকে কাঠের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সিংহের গর্তে রেখে আসা হয়। মেয়েদের মাথায় ধুনুচি থাকে। ঢাক ডুমরু বাজে। সারি সারি মানুষ নানা সাজে তাকে রেখে আসতে যায়।'

'তুমি নিজের চোখে দেখেছ?' ম্যান্ডেলা হাঁটুর নিচে ফ্রক টেনে প্রশ্ন করল।

'না, শুনেছি। সুখিম্বার পোশাক, সুখিম্বার সঙ্গে সব কিছু তার সিংহের গুহায় রেখে আসতে হয়।'

ম্যান্ডেলার ঘুম পাচ্ছিল। সে হাই তুলল।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা বলে গেছে—আসল সুখিম্বার দেখা পাওয়া যাবে, আগুনের গোলা আকাশে ভেসে গেলে।'

'ও কী নকল সুখিম্বা!'

'আরে না না—নকল না। সে তো মড়ক ঠেকাতে পারে না। দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারে না।'

'আর কী ঠেকাতে পারে না।' তারপরই ম্যান্ডেলা বলল, 'মানুষ কী সব পারে! সুখিম্বাই বা পারবে কেন! কেন যে তাকে এত ভয় পাও তোমরা বুঝি না।'

'আকাশ থেকে ভেসে আসবে সুখিম্বার পোশাক। পূর্বপুরুষের আত্মারা পোশাক এনে পরিয়ে দিয়ে যাবে দেবতা সুখিম্বাকে। সে এলেই আর দেশে খরা হবে না। মড়ক লাগবে না। দুর্ভিক্ষ হবে না।'

সেই কোন আদিকাল থেকে মানুষ তার আশায় আছে।

ম্যান্ডেলা ঠাট্টা করে বলল, 'শুধু খাও-দাও, আনন্দ কর। সে এলেই আর দুঃখ থাকবে না। যতসব আজগুবি কথা। কখনও হয়—কাউকে পুড়িয়ে মারলে কেউ কখনও নিরাময় হয়। সুখিম্বা আসলে শয়তান। মানুষকে জব্দ করে রেখেছে।'

মুম্বাটুরও হাই উঠছে।

'তাই, তার হাতেই সব ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে। ফন, প্রধান পুরোহিত সব সে। আলাদা করে আর কেউ সুখিম্বা থাকবে না। ফন থাকবে না।'

'খুব ভাল। এতদিন মানুষ সুখিম্বার জিম্মায় ছিলে, তারপর দেবতা সুখিম্বার জিম্মায় গেলে তোমাদের আরও মজা।'

তারপরই ম্যান্ডেলা ঘুমে ঢলে পড়ল।

মুম্বাটুও।

আর সকালে হঠাৎ মুম্বাটু জেগে গিয়ে ত্রাসের গলায় ডাকছে, 'এই ম্যান্ডেলা, শীগগির ওঠো। শুনছ!'

'কী!'

'কারা নিকারা বাজাচ্ছে।'

দুম, দু....... মু, দু......... ম।

'শুনতে পাচ্ছ!'

ম্যান্ডেলা শুনতে পাচ্ছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে সংকেত পাঠানো হচ্ছে কিসের। মুম্বাটুকে বলল, 'কী মনে হচ্ছে?'

'ফন মারা গেছে। সুখিম্বাকে খুন করেছে মুম্বাটু। মুম্বাটু পালাচ্ছে। মুম্বাটু নিগাই পাহাড়ে আছে।'

মুম্বাটুর চোখ-মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে। সে জানে এর পরিণতি কী। তাকে ধরতে না পারলে, তার মা-বাবা-দাদুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। তার খবর ফনের রাজত্বে পৌঁছে গেছে।

মুম্বাটু বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি!'

'কোথায়?'

'কথা বলার সময় নেই ম্যান্ডেলা। আমার জন্য সবাইকে মরতে দিতে পারি না। হাজার হাজার মানুষ এখন পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে এদিকে আসতে শুরু করবে। শুনতে পাচ্ছ না শিঙ্গা বাজছে।'

ম্যান্ডেলা কী করবে বুঝতে পারছে না। 'আরে টুপিটা কোথায়! এই মুম্বাটু, তুমি টুপি নিয়েছ?'

'কিসের টুপি।'

'আমার পালকের টুপি।'

'না তো।'

সর্বনাশ, শুধু তাকেই ধরতে আসছে না। ম্যান্ডেলাও ধরা পড়বে। সে চিৎকার করে বলল, 'পালাও, শীগগির পালাও।'

ম্যান্ডেলা থ। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

টুপিটা কী কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে!

কে নিতে পারে!

মুম্বাটুকে সে অবিশ্বাস করবে কী করে!

মুম্বাটু বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে কেন! পালাও। ঐ উঠে আসছে!'

সত্যি সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে শয়ে শয়ে পাহাড়ী মানুষ হাতে ঢাল বল্লম নিয়ে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে দূর থেকে অজস্র পাখির পালক উড়ছে। ম্যান্ডেলা কিছু ভাবতে পারছে না। তার পালকের টুপি কোথায়। মুম্বাটু নিয়েছে!

ছিঃ, এটা ভাবা অন্যায়।

সে নিলে টুপি পরে পালাত না।

সে তো দাঁড়িয়ে আছে, বীরের মতো ধরা দেবে বলে। রুপোর ঘণ্টাটা কোথায়!

ঐ তো। ওটা পড়ে আছে। হাইতিতি কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সংগে সংগে ম্যান্ডেলার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে ঘণ্টা বেঁধে হাইতিতিকে বলল, 'বাতাসে ভেসে যা।'

আর যা হয়—বাতাসে ভেসে গেলেই আকাশে ঘণ্টাধ্বনি হয়। এবার ঘণ্টাধ্বনি শুরু হতেই ম্যান্ডেলা দেখল পাহাড়ী মানুষের দলটা থমকে দাঁড়িয়েছে। ইস, এখন হাইতিতি যদি না থাকত! তবে তাদের কী না বিপদে পড়তে হতো! ঘণ্টাধ্বনি শুনে চমকে গেছে। বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি সোজা কথা না! আকাশে অদৃশ্য ঘণ্টাধ্বনি শুনে ওরা ঠিক পালাবে। যা ভীতু!

মুম্বাটু দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। সে রা করছে না। এক হাতে বল্লম নিয়ে সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না পর্যন্ত।

ম্যান্ডেলার কোনো কথারই জবাব দিচ্ছে না। কথা না বললে ভয় হয় না! ম্যান্ডেলা বলল, 'ওরা ঠিক ভয় পেয়েছে মনে হয়।'

কোনো সাড়া নেই।

'আর উপরে উঠে আসতে সাহস পাবে না।'

মুম্বাটু স্থির।

কারণ মুম্বাটু জানে, এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে কে কী ভাববে—অথবা দুষ্টুলোক যদি উসকে দেয় মুম্বাটু ধরা পড়েছে বলে পূর্বপুরুষের আত্মারা আনন্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে, তবেই হয়ে গেল! সেই দুষ্টুলোকের যে সুখিম্বা অথবা ফন হবার ইচ্ছে নেই কে বলবে! দুষ্টু লোকেরাই তো টাকা-পয়সার মালিক হয়, জমিজমার মালিক হয়, ফন হয়, সুখিম্বা হয়। ভাল মানুষেরা খেটে মরে। গরীব হয় তারা। কাজেই মুম্বাটু বুঝছে না কী হবে!

'আরে এই মুম্বাটু, কথা বলছ না কেন!'

'আবার যে উঠে আসতে শুরু করেছে!'

ম্যান্ডেলা বলল, 'মুম্বাটু, ওরা আবার উঠে আসছে কেন!'

ম্যান্ডেলা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এটা এখনও কোনো সান্ত্বনার কারণ হতে পারে। মুম্বাটুর পাশে এক বালিকা—

পাহাড়ী মানুষ হাতে ঢাল বল্লম নিয়ে উঠে আসছে।
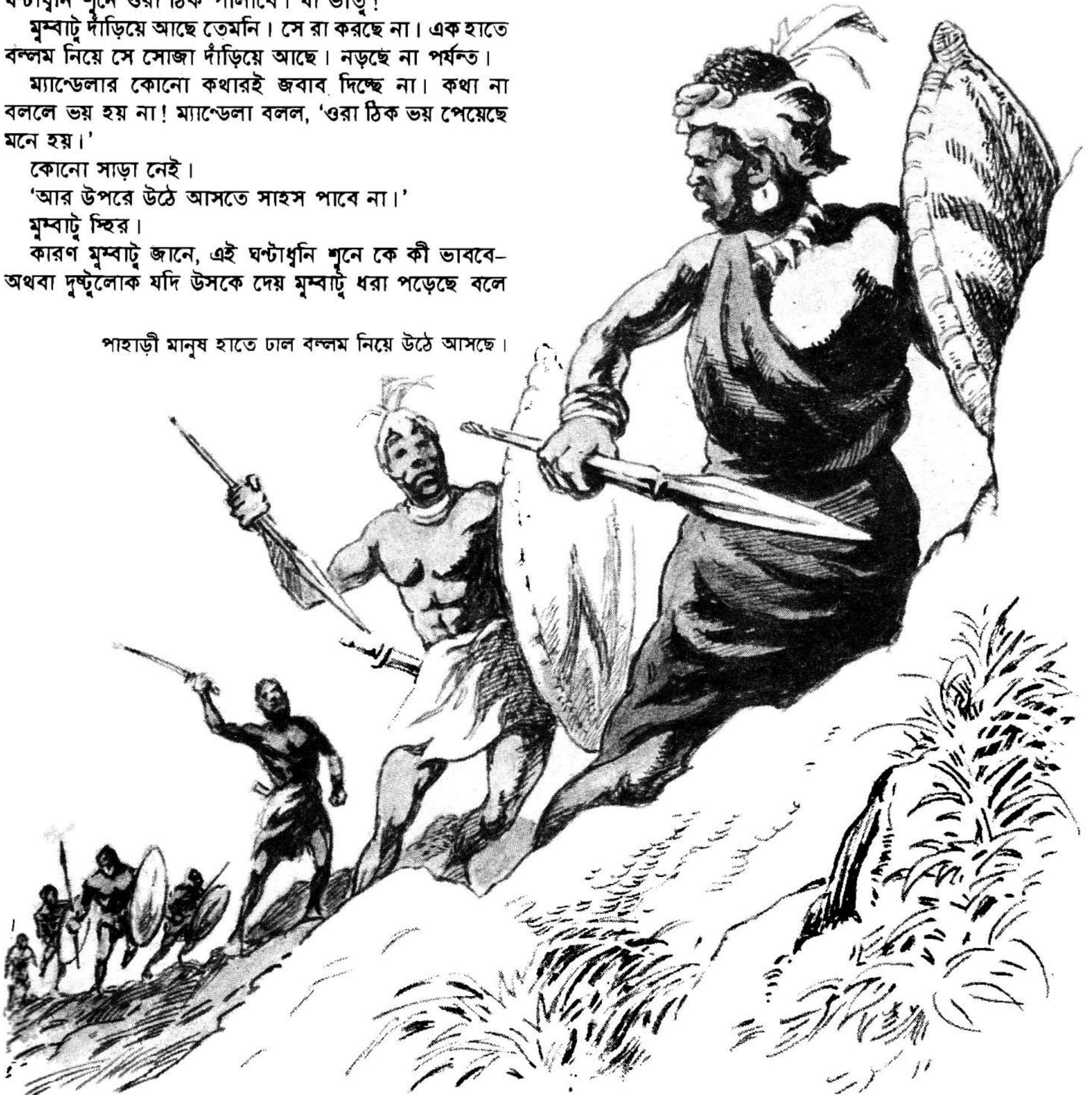
বাতাসে ভেসে আসছে সুখিম্বার আলখাল্লা।

দেবীর মতো দেখতে—যদি রক্ষা পায় ম্যান্ডেলার জন্যই সম্ভব হবে। কিন্তু সাদা চামড়ার মানুষদের তো তারা দেখেছে। বন্য জীবজন্তু শিকার করার জন্য, হাতি ধরার জন্য, কিংবা জিরাফ, গন্ডার ধরার জন্য পাহাড়ী এলাকায় সাদা মানুষেরা ঢুকে পড়লে তারা পিছু নিয়েছে। মোট বয়ে দিয়েছে। তাদের বৌ বেটিদেরও দেখেছে। তার স্বজাতিরা খুব সুনজরে সাদা মানুষদের দেখে না। এ-সব ভাবার সময়ই ম্যান্ডেলা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি।'

'পালাও ম্যান্ডেলা', মুম্বাটু দেখছে ওরা উঠে আসছে। স্বজাতিরা তার পরিবারকে পুড়িয়ে মারার চেয়ে তাকে পুড়িয়ে মারুক। সে যেন অনেকটা হাল্কাবোধ করছে।

তারা অ্যাকাসিয়া বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তারা ছুটে আসছে। বোকা হাইতিতি মনের খুশিতে যত বাতাসে উড়ছে, যত গলার ঘণ্টা বাজছে তত পাহাড়ী মানুষেরা পূর্বপুরুষদের উল্লাস টের পাচ্ছে। বোকা হাইতিতি সেটা বুঝবে কী করে! মুম্বাটুর মুখের রেখায় সামান্য হাসিও ফুটে উঠল। দুঃখের হাসি।

আর তখনই অবাক! চোখের উপর এটা কী দেখছে! পাশে ম্যান্ডেলা নেই। ম্যান্ডেলা উধাও। 'পেয়েছি' এমন যেন একবার বলেছিল। আসলে মুম্বাটু বুঝতে পারছে তারও হুঁশ নেই। হাওয়ায় পালকের টুপি সরে যেতেই পারে। শোবার সময়, তার মনে আছে, ম্যান্ডেলা পালকের টুপিটা তার শিয়রের কাছে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু এ যে ভারি আজব কান্ড!

পাহাড়ী লোকগুলি দেখছে আর তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। বুক থাবড়ে বুয়া বুয়া করছে।

বাতাসে ভেসে আসছে, আকাশ থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সুখিম্বার আলখাল্লা। বন্য জন্তুর চামড়া এখানে সেখানে জোড়া, তাপ্পি দেওয়া। মোষের লোম পোশাকের আচ্ছাদনে—সিংহের লেজ জোব্বার আচ্ছাদনে। বাঘের কান ঝুলছে পোশাকের সংগে। পূর্বপুরুষের আত্মাদের শেষ অমোঘ বাণী তবে ফলে যাচ্ছে। মুম্বাটুও দেখে অবাক। ম্যান্ডেলার কাজ সে বুঝতে পারছে—কিন্তু ওটা সংগ্রহ করা তো কোনো যাদুকরেরও সাধ্যের অতীত। ফন পর্যন্ত পারে না। ম্যান্ডেলা কোথা থেকে নিয়ে উড়ে আসছে?

সে দেখল তার মাথার উপরে পোশাকটা ঝুলছে।

ম্যান্ডেলা বলছে ফিসফিস করে, 'মুম্বাটু, একদম নড়বে না। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাক। আমি পরিয়ে দিচ্ছি।'

পাহাড়ী মানুষগুলোর মুখে এক ধ্বনি, 'বুয়া বুয়া!'

ম্যান্ডেলা বলছে, 'মুম্বাটু, বুয়া বুয়া কী?'

'আপনি এসে গেছেন। আমাদের আর ভয় নেই।'

ম্যান্ডেলা মুম্বাটুর গায়ে আলখাল্লা পরিয়ে দিল। আর তখনই 'জয়, জয় সুখিম্বা! জয় ফন।'

ওরা তো 'জয়' বলতে পারে না।

ওরা বলছে, 'ডুমা ডুমা। ডেলু টাকেন।'

ম্যান্ডেলা পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডুমা ডুমা—ডেলু টাকেন কী?'

ওরা বলছে, 'আপনি আমাদের ফন। ফনের মৃত্যু হয়েছে। আপনি আমাদের নতুন ফন। নতুন সুখিম্বা।'

ম্যান্ডেলা বলল, 'এবারে তবে চলি, আর শোন মুম্বাটু, তুমি কিন্তু আগে তোমার দাদুর কাছে গিয়ে আশীর্বাদ চাইবে। কী মনে থাকবে তো! বুড়োকে বলেছিলাম, তোমার নাতিকে আমি ঠিক ফিরিয়ে দেব।'

'এ তো ফিরিয়ে দেওয়া নয়। এ তো রাজা করে দেওয়া!' মুম্বাটুর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতায়।

ছবি : গুপ্রসাদ রায়

ম্যান্ডেলা নিখোঁজ বাবার খোঁজে এসে অরণ্য-রাজ্যে বেশ ক'দিন কাটিয়ে দিল। মুম্বাটু এখন উপজাতি সর্দার। তবে কিবা বয়স। চতুর মানুষের তো অভাব নেই। মুম্বাটু তার উপজাতির সর্দার হয়েই হুকুম জারি করে দিল, তার রাজ্যে কোনো ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসী থাকবে না। কেউ ইচ্ছে করলেও রাখতে পারবে না। ফনের আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার!

অরণ্যরাজ্যে ম্যান্ডেলা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপজাতিদের সর্দার হলেই নিয়ম তাকে একা সিংহ শিকার করতে যেতে হবে। এত সব অলৌকিক কান্ডকারখানা ম্যান্ডেলার দেখার পরও মুম্বাটু তার পটুত্ব দেখানোর জন্য সিংহ শিকারে যাবে ঠিক করেছে।

সর্দারের গোলঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এই ঘরটায় ম্যান্ডেলা থাকছে। হাইতিতি থাকছে। বাঁশের মাচান। মাটির দেয়াল। উপরে বাওবাব পাতার ছাউনি। খরগোশের লোমের নরম বিছানা।

কালো লম্বা দীর্ঘকায় সুপুরুষ মুম্বাটু সর্দারের পোশাকে হাজির। মাথায় পালকের মুকুট। হাতে বল্লম। তাতে উটপাখির পালক গোঁজা। সারা গায়ে নানা রঙবেরঙের উলকি। ম্যান্ডেলা কোনো দেবী যেন, একবার তার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায় না। ম্যান্ডেলা তো উড়ে চলে যাচ্ছিল। ফনের পোশাক হাওয়ায় উড়ে এসে জড়িয়ে গিয়েছিল মুম্বাটুর শরীরে। সবই জাদুকর বসন্তনিবাসের দয়ায়। তার পালকের গুণে। রুপোর ঘণ্টা হাইতিতির গলায় না বাজলে উপজাতিরা মুম্বাটুকে কিছুতেই ফন বলে স্বীকার করে নিত না।

এত সব কান্ড হবার পর মুম্বাটু কোথায় সব অগ্রাহ্য করবে, না তিনি চললেন সিংহ শিকারে।

আরে অকারণে একটা সিংহের প্রাণ নেওয়া কি ঠিক! সে তার মতো বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দল বেঁধে না

থাকলেও ম্যান্ডেলা সাত-আটটা সিংহ-সিংহীকে ঘাসের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। ছোট ছোট দু-তিনটে বাচ্চা। বেড়ালছানার মতো লাফাচ্ছে, কামড়াকামড়ি করছে, আবার ছুটছে। সিংহ শিকার করলে ওটা তো কারো মা না হয় বাবা হতেই পারে। বাচ্চাগুলোর কথা ভাববে না! অকারণে একটা সিংহকে মেরে ফেলা হবে। কিংবা এতে মুম্বাটুর জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

ম্যান্ডেলা রেগেমেগে বলল, 'যা খুশি কর। আমি চলে যাচ্ছি।'

'আরে তুমি রাগ করছ কেন বুঝি না। পারিবারিক প্রথা মানতে হয় না। তুমি এত অবুঝ!'

'আমি না তুমি!' ম্যান্ডেলা চটেই আছে।

বাইরে মুম্বাটুর রক্ষীরা বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গোলঘরে ঢোকার কারো নিয়ম নেই। যতক্ষণ না ফন ডেকে পাঠাবেন। মাননীয় অতিথিদের রাখা হয় গোলঘরে। রাজার অতিথি। মুম্বাটু শুধু ফন না, তারও উপরে। তাকে আগুনে পোড়ানো যায়নি—ফনের নিরাময়ের জন্য

তাকে আগুনে উৎসর্গ করতে গিয়ে ওঝা গুণিন সব মরেছে। পুরোহিত মরেছে। পুরোহিতের ইচ্ছামৃত্যু, সেই পুরোহিতও রক্ষা পায়নি। বাতাসের আগে উড়ে গেছে খবর। কালাবাস বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন ফনের নাম, তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। বলং নদীর পাড় থেকে একদল ইসলাম উপাসক এসে নানা উপঢৌকন দিয়ে গেছে। তার মধ্যে আছে দুটো ঘোড়া।

ম্যান্ডেলা বলল, 'প্রথা তুলে দাও। জান অকারণ জীবহত্যা করতে নেই।'

'কে বলেছে?'

'জাদুকর বসন্তনিবাস বলে গেছে।'

'সে আবার কে?'

'তুমি না সব ভুলে যাও মুম্বাটু। সে আবার কে বলতে হবে! সেই তো পালকের টুপি দিয়ে গেল। হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা। ও দুটো না পেলে সমুদ্র পেরিয়ে এত দূরদেশে আসতে পারতাম! কত গুণ! ওটা আছে বলেই তোমাকে রক্ষা করতে পেরেছি। ওটা পরলেই অদৃশ্য হয়ে যাই—কত বার তো চোখের উপর দেখেছ। উড়ে যাই। কেউ দেখতে পায় না, বাতাসে ঘণ্টা বাজে। কতবার বলব।'

'কিন্তু মুশকিল।'

'কি মুশকিল!'

'তুমি তো চিরদিন থাকছ না। সিংহ শিকার করে না ফিরতে পারলে, খটকা থেকে যাবে।'

'ধুস খটকা। রাখ। বলে দাও, আজ রাতে দৈববাণী হবে, সিংহ শিকারে যাওয়া ঠিক কি ঠিক না আজ রাতে দৈববাণীতে জানা যাবে।'

মুম্বাটু পড়েছে মহাফাঁপরে। উপজাতির প্রথাকে অমান্য করা ঠিক হবে কিনা জানে না। প্রকৃতির রোষ আছে। অজন্মা হতে পারে, বানবন্যায় ভেসে যেতে পারে—আবার অরণ্যে দাবাগ্নি শুরু হলে তার রাজত্ব ছারেখারে যাবে। তার উপজাতিদের মঙ্গল হবে ভেবেই সে সিংহ শিকারে যেতে চায়।

ম্যান্ডেলা বলল, 'তুমি তো শুধু মানুষের রাজা নও। জীবজন্তুরও। তারাও যদি অনাহারে মারা যায়—তোমার দোষ হবে। আর তুমি কিনা প্রথা রক্ষার্থে যাচ্ছ সিংহ শিকারে। মানুষ তো বেঁচে থাকতে চায়। জীবজন্তুরাও। কিন্তু সে তো উপদ্রব। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রাখে জান! এ-সব প্রথা, সংস্কার দেবতা, সব এ-জন্য।'

'কে বলেছে!'

'কে বলবে আবার, জাদুকর বসন্তনিবাস বলেছে। তাকে তো তুমি দেখলে না। হেই লম্বা মানুষ। মাথায় রাজমুকুট। পায়ে নাগরাই জুতো। গায়ে লতাপাতা আঁকা জোব্বা। আর ছোট-বড় অজস্র পকেট।'

'কি থাকত পকেটে!'

'পকেটে কি থাকত না বল! যখন যা চাইতাম, পকেট থেকে তুলে দিত।'

'বাঘের বাচ্চা চাইলে পেতে!'

'হ্যাঁ।'

'চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

মুম্বাটুর চোখ ছানাবড়া। সে বলল, 'বাপস, সে কোন দেশের লোক?'

'ইন্ডিয়া। নাম শুনেছ?'

মুম্বাটু বলল, 'সেটা আবার কি দেশ। কেমন দেশ। নাম শুনিনি। তুমি শুনেছ!'

'আমিও শুনিনি। তবে বুচার মামা সব খবর রাখে। ওটা নাকি প্রাচীন দেশ। মানুষেরা সেখানে হাজার বছর ইচ্ছে করলে বেঁচে থাকতে পারে। হিমালয় বলে যে বিশাল পর্বত আছে, ওটা ওদের দেশেই। হিমালয়ের নাম শুনেছ?'

মুম্বাটু খুবই বিচলিত। সে তো জানে বলং নদীই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ সীমানা, যদিও গীর্জায় ফাদারের কাছে সে পাঠ নেবার সময় নানা দেশ, সমুদ্র এবং দ্বীপের কথা শুনেছে—তবে বিশ্বাস করতে পারেনি। ওমারো উপজাতি ছাড়া বান্টু উপজাতি আছে, ইসলাম উপাসকদের দেশেও সে একবার গেছে। ওল্ডমালি ঘুরে এসেছে। সবই পায়ে হেঁটে। বুড়ো ঠাকুরদা তাকে দেশ চেনাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে গেছিল। কেইলা, দেজিলা, কাংবা, এমন কি খুব দূরদেশ তিমবুকতোর নামও শুনেছে। সেখানে বলং নদী তার উপনদী শাখানদী নিয়ে এত বিস্তারলাভ করেছে যে দেখলে ঘরে ফেরা কঠিন। পাহাড় আর পাহাড়—সাভানার জঙ্গল বলেও একটা জায়গা আছে—কিন্তু ইন্ডিয়ার নাম সে শোনেনি। জানে না। পকেটে বাঘের বাচ্চা নিয়ে যে ঘুরে বেড়ায় সে ম্যান্ডেলাকে একটা পালকের টুপি, ক্যাঙারুর বাচ্চা হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা দেবে, বেশি কি।

তবু কিছুটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলল, 'যাঃ, হয় নাকি!'

'হয় না! আমি অদৃশ্য হতে পারি, বাতাসে ভেসে যেতে পারি, হয় কি করে!'

'তা বলে পকেটে বাঘের বাচ্চা!'

ম্যান্ডেলা বাঁশের মাচানে, হরিণের চামড়ার গদিতে পা ভাঁজ করে বসেছিল। সাদা ফ্রক গায়ে। মুম্বাটু দাঁড়িয়ে আছে। ম্যান্ডেলা বোঝে, মুম্বাটু তাকে দেবীটেবি ভেবে থাকে। সে তার কাছে এসেই নতজানু হয়। মাথা নিচু করে। তারপর বিড়বিড় করে কী সব ছাইপাঁশ কথা বলে সে বোঝে না।

'আরে তাই তো। পকেটে বাঘের বাচ্চা। নিজের চোখে দেখা।' কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না। ম্যান্ডেলা বেশ জোর দিয়ে বলল, 'জান আমি তো একা না। জান আমাদের পাইন ফেস্টিভ্যালে বসন্তনিবাস লম্বা পাতার বাঁশি বাজিয়েছিল। আমাদের তখন বড়দিনের উৎসব। আমরা শিশুরা জাহাজঘাটায় গিয়ে বসে থাকতাম। কখনও পার্কে। জাহাজ থেকে সে নেমে আসত রাজার মতো। জোব্বায় সেপটিপিনে আটকানো খেলনা। সে না দেখলে, বিশ্বাস করবে না, কত আশ্চর্য সব খবর দিয়ে যেতে পারে একজন জাদুকর।'

'পকেট থেকে বাঘের বাচ্চা বের করে দেখাল!'

'দেখাল মানে, লাফ দিয়ে বের হয়ে এল। বসন্তনিবাসের পায়ের কাছে বসল। বসন্তনিবাসের কান যত ফরফর করে তত বাচ্চাটা বড় হতে হতে বাঘ হয়ে যায়। কান ফরফর না করলে, আবার বাঘটা বেড়ালছানা হয়ে যায়। স্বচক্ষে দেখা। পকেটে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে।

বসন্তনিবাস কত সুন্দর সুন্দর কথা বলত। সেই তো বলেছে, সবচেয়ে সুন্দর হলো ফুল। শিশুরা নাকি ফুলের মতো। কোনো দাগ লেগে থাকে না। ঈশ্বর ফুলকে সব দিয়ে সাজিয়েছেন—কেবল আত্মা দেননি। ফুলের কুঁড়ি হয়, ফোটে, ঝরে যায়। বসন্তনিবাস বলত, শিশুদের মধ্যে ফুল এবং আত্মা দুই আছে। এ-জন্য শিশুরা তার কাছে ফুলের চেয়েও সুন্দর।'

মুম্বাটু অবাক বিস্ময়ে বসন্তনিবাসের কথা শুনছে। এমন সব সুন্দর কথা বলার জন্যই ম্যান্ডেলা যেন তাদের অরণ্য রাজ্যে হাজির। ম্যান্ডেলা না এলে আশ্চর্য জাদুকরের কথাও জানতে পারত না। তারপর কি ভেবে বলল, 'কবে এসেছিল, জাহাজঘাটা, সেখানে কি হয়?'

'কিছু জান না মুম্বাটু। এদিকে ফন হয়ে বসে আছ! তোমাকে তো লোকে ঠকাবে। এখন থেকে সাবধান না হলে চলবে কেন? জাহাজঘাটা কি জান না! ইন্ডিয়ার নাম শোননি। ওদের দেশে মুনিঋষিরা হাজার হাজার বছর বরফের নিচে জেগে বসে থাকে। উপাসনা করে। বসন্তনিবাস কবে এসেছিল! দাঁড়াও বলছি।' কড় গুণে বলল, 'তা দশ বছর।'

'বা তা হয় কি করে! দশ বছর পরেও তুমি ম্যান্ডেলা আছ! ছোট আছ। বালিকা আছ।'

'আরে বুঝছ না কেন, বসন্তনিবাস তো বলে গেছে, যতদিন বাপকে খুঁজে বের করতে না পারব—বালিকাই থাকব। বয়স বাড়বে না। দশ বছর পরও যা বিশ বছর পরও তাই। বাবাকে খুঁজে না পেলে সারাজীবন ম্যান্ডেলাই থেকে যাব।'

মুম্বাটুর মুখে কথা সরছে না।

সত্যি বিস্ময়ের ঘোরে পড়ে যাচ্ছে মুম্বাটু। না তার আর কোনো দ্বিধা নেই। তারও মনে হলো, যিনি পালকের টুপি দিতে পারেন, রুপোর ঘণ্টা দিতে পারেন, তিনি ম্যান্ডেলাকে বালিকাই করে রাখতে পারেন। বাবাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে বলল, 'আচ্ছা আমি তোমার সঙ্গে যদি যাই।'

'তুমি যাবে কি করে! তুমি বাতাসে উড়ে যেতে পারবে?'

মুম্বাটু বলল, 'দুটো ঘোড়া দিয়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে পড়লে কেমন হয়! আমরা বসন্তনিবাসকেও খুঁজব। খুঁজতে খুঁজতে ইন্ডিয়ায় চলে যাব। কী মজা হবে না?'

ম্যান্ডেলা গম্ভীর হয়ে গেল।—'তুমি না ফন! তোমার এই বাচালতা শোভা পায় না।'

ফন বলতেই মুম্বাটু শরীরে একটু তেজীভাব আনার চেষ্টা করল। সে ফন, মনে হলেই হাজার রকমের সংস্কারও জড়িয়ে ধরে তাকে। এই উপজাতি বেঁচে আছে বুড়ো তানসিয়ার দয়ায়। আগে কি একটা নাম ছিল তাঁর। পরে উপজাতিদের কাছে তিনি তানসিয়া হয়ে গেছেন। যেমন তারা চাষ করতে পারে, এবং গরু-মোষও চরাতে পারে। আগে প্রথা ছিল, হয় গরু-মোষ চরাও, না হয় চাষ কর। গরু-মোষ

চরালে এক জায়গায় থাকা যায় না। যেখানে ঘাস, সেখানেই চলে যেতে হয়। খরায় জ্বলেপুড়ে গেলে, তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে হয়। বলং নদীর পাড় ধরে তখন শুধু গরু-মোষের পাল নিয়ে হাঁটা। কোনো ঘাসের উপত্যকা খুঁজে পেলে আবার তাঁবু ফেলা। তাদের একদল চলে গেছে, এই জঙ্গলের গভীরে, কিংবা আরও দূরে—কিংবা নাড্রো জলপ্রপাত পার হয়ে আরও দূরে। কিন্তু তার উপজাতি ভালো চাষও জানে না, ভালো যাযাবরও হতে পারেনি।

সিংহ শিকারে যেতে পারছে না জেনে মন দমে গেছে মুম্বাটুর। ইচ্ছা করলে ম্যান্ডেলাকে অবজ্ঞা করতে পারে। ম্যান্ডেলাকে আটক করেও রাখতে পারে। কিন্তু তখনই মনে হয়, তাকে আটক করা অসম্ভব। জাদুকর বসন্তনিবাস তবে চলে আসতে পারে। লাঠি হাতে দাঁড়াতে পারে পাহাড়ের মাথায়। বলতে পারে, মাটিতে লাঠি ঠুকে, সব পাতারা ঝরে যাও। ফুল আর ফুটো না, আকাশ মেঘে ছেয়ে যেও না। কীট-পতঙ্গ উড়ে এসে ঢেকে দাও দেশটাকে। মরুভূমি করে দাও।

জাদুকর পারে না হেন কাজ নেই।

যেন বললেই, অজন্মা শুরু হয়ে যাবে।

যেন বললেই, মড়ক শুরু হয়ে যাবে।

নিজের পাপচিন্তার কথা ভেবে মুম্বাটু কেমন উদ্বেগের মধ্যে পড়ে গেছে। ফন হলেই বোধহয় বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভ হয়। আগে তো সে এ-সব ভাবত না। তা-ছাড়া মৃত ফনের জন্যই তো তাকে পাহাড়ের মাথায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘোস্ট-হাউজে কোলাবাস বাজানো হয়েছে। লাঠির ডগায় পূর্বপুরুষদের মাথার খুলি নিয়ে নৃত্য করা হয়েছে। তখন তো সে কেমন ঘোরের মধ্যে ছিল। পুরোহিত যখন বিধান দিয়েছেন, মুম্বাটুকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করলেই ফন আবার ভালো হয়ে যাবেন, তখন উৎসর্গ করা ছাড়া উপায়ই বা কি!

সেই বধ্যভূমিতে কে যেন উড়ে এসে পাশে ফিসফিস করে বলছে, 'না মুম্বাটু, না। তুমি আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেও না। সব বুজরুকি।' আগুনে পুরোহিত সিংহের লেজ, বাঘের থাবা, হরিণের শিং উৎসর্গ করছেন। পাহাড়ের উপত্যকায় হাজার হাজার মানুষ জড় হয়েছে। মুম্বাটুর আত্মা আবার ফনের মধ্যে ঢুকে গেলে ফন ভালো হয়ে উঠবে। তখনই এক কথা, না না, মুম্বাটু, সব বুজরুকি।

তোমার আত্মা আর কারো উপর ভর করতে পারে না মুম্বাটু। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেও না। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে উলঙ্গ নরনারীরা নাচছিল। বর্শা তুলে, নামিয়ে, মশাল উপরে তুলে নাচছিল। দূর দূর থেকে কাতারে কাতারে এসে মানুষ জড় হচ্ছে। এমন পবিত্র অনুষ্ঠান দেখে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে তারা চলে এসেছে। ম্যান্ডেলা না থাকলে, সে তো পুড়ে ছাই হয়ে যেত। আর কিনা, সেই ম্যান্ডেলাকে ভাবছে আটক করে রাখবে!

তার চোখে জল এসে গেল। ম্যান্ডেলার সামনে নতজানু হয়ে বলল, 'দেবী, আপনার আজ্ঞা। আপনি দৈববাণী করুন।'

ম্যান্ডেলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে এখন ঘুমাতে দাও। আচ্ছা মুম্বাটু, আনারস পাওয়া যায়?'

'আনারস!'

'হ্যাঁ, হাইতিতি আর থাকতে চাইছে না। কেবল বলছে, দেশে ফিরে চল। কত দিন আনারস খাই না।'

'আনারস!' মুম্বাটু মাথা চুলকাতে থাকল। আসলে আনারস মানে পাইন-আপেল, কিন্তু শুধু বইয়ে পড়েছে, সে গীর্জায় পড়াশোনা করেছে। ফাদার তাকে রাখতে চেয়েছিলেন। দূরে কালাবো পাহাড়ের মাথায়—দশ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে তিনটে টিনের চালা, ওতে বুড়ো বাবা থাকেন। হাতে লম্ফ জ্বালিয়ে অরণ্যের ভিতর হেঁটে যান—আর যীশুর বাণী প্রচার করেন। কেউ কেউ যীশুর বাণী জপ করছে—তবে পালিয়ে—কিংবা কখনও তাদের ফন দেশান্তরী করে ছাড়ে। হয়তো সেও গিয়েছিল কালাবো পাহাড়ে বুড়ো ঠাকুরদার হাত ধরে—কে জানে, তারও কথা ছিল কিনা, যীশুর বাণী জপ করায়—ভয়েই পুরোহিত হয়তো প্রচার করে দিয়েছিলেন, দেবতা ইনু মুম্বাটুর আত্মা হাতে চান। ফনকে বাঁচাতে হলে মুম্বাটুকে আগুনে ঝলসাতে হবে। তারপর মহাপ্রসাদ। নরমাংসভোজী মানুষের কাছে এটা পরম উল্লাসের বিষয় হতেই পারে। কারণ কেউ মরে গেলে, তাকে ফেলে দেওয়া হয় না। তার মাংস ঝলসে, পাতে পাতে মহাপ্রসাদের ভোজ। এবং কঙ্কাল, করোটি সব জমা থাকে ঘোস্ট-হাউজে। কত বছর ধরে এই চলে আসছে। ফনের রাজত্বে মুন্ধবিগ্রহও হয়ে থাকে। মানুষের করোটি দরজার মুখে ঝোলানো—কত রকমের গাছপালা, জঙ্গল এবং ঘন গভীর অরণ্যে এইসব নিয়মকানুন দীর্ঘদিন চলে আসছে।

ম্যান্ডেলা ঘোস্ট-হাউজের দিকটায় গেলেই টের পায় নিচে পাহাড়ের খাদে মানুষের হাড়ের স্তূপ। এরা নরমাংসভোজী কিংবা গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়াও খায়। মুরগি খায়। চাষ-আবাদের জমিও আছে। তবে ভালো ফসল ফলাতে জানে না। অভাবে পড়লে বলং নদী থেকে কুমীর শিকার করে নিয়ে আসে। তার মাংস খেতেও নাকি খুব উপাদেয়। তবে ম্যান্ডেলার এ-সব খাবারের কথা শুনলে বমি পায়। তার জন্য চেরি ফল, আপেল ফল জমা করা আছে একটা মাটির পাত্রে। ম্যান্ডেলা ইচ্ছে করলে, উড়ে যায়, দূরে বলং-এর মোহনায় জাহাজঘাটা আছে, তা-ছাড়া হাট-বাজারও বসে। সেখানে নানা জাতের খাবার, তরমুজ সে দেখেছে, ঢালাও বিক্রি হচ্ছে। চীনা বাদামও। তবে আনারস দেখতে পায়নি।

হাইতিতির আবদার রাখতে হলে, আবার উড়ে যেতে হবে। সে তাহিতি দ্বীপপুঞ্জে আনারসের ক্ষেত দেখে এসেছে। উড়ে আসার সময়, নিচের জমিগুলো কেমন ছককাটা দাবার মতো দেখায়। ঘরবাড়ি বোঝা যায় না। তবে পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে এলে টের পায় উঁচুনিচু পাহাড়শৃঙ্গ ব্যাপ্ত আকাশের নিচে ছড়িয়ে আছে। সমুদ্রের নীল জলও দেখতে পায় কখনও। ঝাউ এবং পাইনের জঙ্গলের মতো দাপাদাপি বাতাসে—নীল জলে ঝড়ের সমুদ্র দেখলে তার এমনও মনে হয়। উড়ে আসে হাজার হাজার শঙ্খচিল এবং বাতাসে গ্লাইড করলে ম্যান্ডেলা হাইতিতিও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এবং প্রথমে পাখিগুলি কিছুটা ভয় পায়! অদৃশ্য রুপোর ঘণ্টা কানের কাছে ঢং ঢং করে বাজলে কে না ভয় পায়। পরে তারা বুঝতে পারে হাইতিতি, একটা ছোট্ট ক্যাঙারুর বাচ্চা, আর ম্যান্ডেলা, সাদা ফ্রক গায় বালিকা,

মেঘ সরে গেলেই তারা ছুটে আসে বন্ধুত্ব পাতাতে।

মুম্বাটুর লোকজনেরা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে যাচ্ছে আনারসের খোঁজে। ম্যান্ডেলা বুঝল, মুম্বাটু খুবই আতান্তরে পড়ে গেছে—কোথায় পাবে আনারস! তার চেয়ে তরমুজ পেতে পারে। অবশ্য হাইতিতি নিজেও গিয়ে তরমুজ তুলে আনতে পারে। তবে এই গভীর বন-জঙ্গলে হাইতিতিকে একা ছাড়তে ভরসা পায় না। দিক নির্ণয় জানে না। এটাই খুব বিপদের। সে থাকলে, হাইতিতি যত দূরেই লুকোচুরি খেলুক, হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না। তার তো খেলার সাঙ্গোপাঙ্গর অভাব নেই। কখনও ম্যান্ডেলা রুপোর ঘণ্টা খুলে দিলে, জঙ্গলের খরগোশ, ইঁদুর এবং ব্যাঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে হাইতিতি। এই জঙ্গলেই যে কত বার তাকে আতঙ্কে ফেলে দিয়ে হাইতিতি নানা মজা করেছে!

হাইতিতি নেই।

ম্যান্ডেলা জাদুকরের পালকের টুপি মাথায় খুঁজতে বের হয়েছে। খুশিমতো সে তার বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ইচ্ছে হলে, দ্রুত বাতাসে ভেসে যেতে পারে। কিংবা ধীরে ধীরে, কিংবা কোনো বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে হাইতিতির লেজ টেনে তুলে নিতেও পারে। আবার একটা লরিস লেমুর মতো ডাল বেয়ে গাছের ডগায় উঠে যেতে পারে। হাইতিতিও কম যায় না। এক কাঠি উপরে। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেই ক্যাঙারুর বাচ্চাটা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে। পিছু তাকায়। একবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল অতিকায় একটা সামুদ্রিক কচ্ছপ। বাড়িতে থাকলেই এমন সব উপদ্রবে পড়ে যেতে হয়।

মা তো হঠাৎ হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। তা দিতেই পারে। এমনিতেই নিউ প্লাইমাউথ শহরটায় ম্যান্ডেলাকে নিয়ে নানা গল্প চাউর হয়ে গেছে। কেউ বলে, মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে, কেউ বলে মেয়েটাকে পরীরা তুলে নিয়ে যায়, দু-চার দিন এমন কি হপ্তা পার হয়ে যায়, ম্যান্ডেলার মা, মামা বুচার খোঁজাখুঁজি করে। প্রথম দিকে তো পুলিশ, নগরপ্রধান, দেশের সরকার পর্যন্ত মাথা গলিয়েছিল, মেয়েটা যায় কোথায়! কেন এ-ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়! কোথায় যায়! তখন ক্যাঙারুর বাচ্চাটাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকাল মামা কিংবা মা আর এতটা আতান্তরে পড়ে যায় না। কিন্তু ঘরে সে যদি বসে থাকে, আর একটা বিশাল সামুদ্রিক কচ্ছপের সঙ্গে সে গল্প জুড়ে দেয় তবে তো আশ্চর্য হবারই কথা। মার কি দোষ! সে কত করে যে বলবে, এস না মা। কিছু করবে না। ভয় নেই। হাইতিতির বন্ধু। আমারও।

এ-দেশটার নাম আফ্রিকা সে জানে। যত উড়ে যায়, বিচিত্র সব পাখি দেখতে পায়। দেখতে পায়, বিশাল বাওবাব গাছের ডালে, গুঁড়িতে এবং গাছের ছায়ায় সিংহের পাল শুয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ঝিমুচ্ছে। আবার তার যখন ইচ্ছে হয় মজা করার, সে সিংহের পালের মধ্যে নেমে যায়। যতই অদৃশ্য থাকুক, শত হলেও মানুষের গন্ধ—মানুষের গন্ধ পেলেই কেমন লেজ নাড়তে থাকে, কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। চিতাবাঘ সে কখনও জোড়ায় দেখেনি। ঘাসের জঙ্গলে সে দেখেছে, গুটি গুটি চিতাবাঘ এগিয়ে যাচ্ছে। চোখ জ্বলছে। সে জানে দূরে, ঘাসের উপত্যকায় কিংবা নির্জন নদীর অববাহিকায় চিতল হরিণেরা ঘাস খাচ্ছে। তারা জানবে কী করে একটা ধূর্ত চিতা সন্তর্পণে ঘাসের আড়ালে এগিয়ে আসছে।

তখন যে তার কি হয়! সে আপ্রাণ উড়তে থাকে। এবং হাইতিতির গলায় ঘণ্টা বাজলে হরিণগুলি সচকিত হয়। দৌড়াতে থাকে। তবে চিতাবাঘ বলে কথা। তার থাবা বড় ক্ষুরধার। তার নজর বড় কঠিন। ঠিক শিকার লক্ষ্য করে ছুটছে।

সেও কম যায় না।

সে তো বাতাসের আগে ভেসে যেতে পারে।

সে তো উড়ে গেলে কেউ দেখতে পায় না।

বাতাস ভেদ করে চিতার শিকার সামলানো কত কঠিন সে জানে। তবু তার প্রাণে বড় মায়া। চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। বেচারা নিরীহ হরিণ, চোখে কাজল মাখানো মায়ামমতা—সে কেমন কিছুটা ঘোরের মধ্যেই পড়ে যায়।

চিতল হরিণের ঘাড়ে ঠিক থাবার মুখে বাঘের নাকে একটা ঘাস ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা পিঠে চেপে বসলে, চিতাবাঘটা দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যায়। গড়াগড়ি খায় মাটিতে। হাঁচ্চো দেয়। আর থাবায় নাক চুলকালে তার বেদম হাসি পেতে থাকে। সে হা হা করে হাসলেই বোধহয় বাঘটা ভয় পায়, আর তখন দু'লাফে জঙ্গলে ছুটে গিয়ে বসে। হাঁপায়। তখন চিতল হরিণের দলটা কোথায় বেমালুম অদৃশ্য—যতদূর চোখ যায় শুধু বনরাজিনীলা, দূরে পাহাড়ের ছায়া এবং ব্যাপ্ত, নীল আকাশ। আর ঘন নীল রোদ্দুরে অজস্র ফড়িং, প্রজাপতি, বক, সারসের ওড়াউড়ি। সে বুঝতে পারে কাছেই কোনো জলের হ্রদ আছে। তার তখন তেষ্টা পায়।

ম্যান্ডেলা দেখছে মুম্বাটুর শুকনো মুখ। কারণ আনারস পাবে কোথায়? শত হলেও অতিথি, তা-ছাড়া এই রাজ্যপাট যা কিছু সব ম্যান্ডেলার দয়ায়, তাকে অবহেলা করতে পারে না। যেখান থেকেই হোক হাইতিতির জন্য আনারস আনা চাই।

তা-ছাড়া সিংহ শিকার করতে যেতে পারবে না—এটাও দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। ম্যান্ডেলা বলেছে, দৈববাণী হবে। তা হতেই পারে। ম্যান্ডেলা সব জানে, এবং জানে বলেই কখন তাকে কি করতে হবে বলে যাচ্ছে।

এখন চাই আনারস।

ম্যান্ডেলা বাইরে এসে দাঁড়াল। মুম্বাটু বাইরে এসে দাঁড়াল।

ম্যান্ডেলা বলল, 'ঘোড়া দুটো কোথায় রেখেছ?'

মুম্বাটু বলল, 'ক্রিলের ভিতর। রবসানির মাঠ পার হয়ে যেতে হবে।'

এইসব জনপদ অদ্ভুত। তার শহরে কল টিপলে জল, সুইচ টিপলে আলো, নব ঘোরালে গ্যাসে রান্না—তাদের কাঠের মিকি মাউসের মতো রঙবেরঙের বাড়ি আর এই চালাঘরে কত তফাত! মাটির দেয়াল, যতদূর চোখ যায় শুধু ঘাসের জঙ্গল, মাঝে মাঝে টিলা, এবং পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ি—বড় বড় কাঠের খুঁটি পুঁতে দুর্গের মতো করে রাখা হয়েছে—হিংস্র জীবজন্তুদের হাত থেকে এটাই একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়।

ম্যান্ডেলা বলল, 'মুম্বাটু, শোন।'

মুম্বাটু তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আনারস আনতে হবে না। হাইতিতি

কোথায় গেল আবার!'

'আনারস আনবে বলে যারা বের হয়ে গেল, তাদের পিছু পিছু গেছে।'

'ওদের ফিরে আসতে বল।'

দ্যাখ হাইতিতি, একদম বাঁদরামি করবে না

কালাবাস বাজিয়ে দেওয়া হলো। অদ্ভুত সব সংকেত দূর থেকে দূরের পাহাড়ে চলে যায়। এবং সে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল, হাইতিতি ব্যাজার মুখে হাজির সে আনারস খাবে বলে বসে আছে, ম্যান্ডেলা দিল সব মাটি করে। রাগে ফুঁসছে হাইতিতি।

সে বলল, 'দ্যাখ হাইতিতি, একদম বাঁদরামি করবে না। তোমার কি আনারস না খেলেই চলছে না। ক'টা তো দিন। মুম্বাটুর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ইসলাম উপাসকদের দেশে যাব ভাবছি। কবে আবার আসব, আর আসা হবে কিনা কে জানে!'

হাইতিতি লেজের ডগায় বসে আছে।

'তুমি এক কাজ কর মুম্বাটু। তোমাদের এ-দিকটায় তরমুজ হয় দেখেছি, তরমুজ আনিয়ে দাও।'

মুম্বাটু বলল, 'আজ্ঞে যাচ্ছি।'

আজ্ঞে বলায় মুম্বাটুর উপর ক্ষেপে গেল ম্যান্ডেলা। সে বলল, 'দ্যাখ মুম্বাটু, তোষামোদ করবে না। আমি যা করেছি জাদুকর বসন্তনিবাসের দয়ায়। আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোটই হব। আমাকে আজ্ঞে আপনি করছ কেন? আগে তো করতে না। একজন ফনের পক্ষে একটা শোভা পায় না।'

মুম্বাটু চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ম্যান্ডেলা কিছু বললে না শুনে যাবার সাহস তার নেই।

সে শুধু বলল, 'ঠিক আছে।'

'না, ঠিক আছে না, যদি কিছু ঠিক থাকে, তবে তার নাম জাদুকরের পালক। তার নাম জাদুকর বসন্তনিবাস। সবারই জন্য একজন জাদুকর থাকা দরকার। শিশুদের জন্য তো বটেই। তোমাকে আনারস আনতে বলা আমারই উচিত হয়নি। ও কি আনারস খায় না? কত খায়! খেতে খেতে মুখ পচে যায়। তখন তো আনারসে মুখ দিতে চায় না।'

তারপর কী ভেবে বলল, 'কান ছিঁড়ে ফেলব হাইতিতি। খুব মজা তোমার, না! ওদিকে মা তো ঘরবার করছে। কিন্তু রাতটা কাটাতে হয়। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ঘাসের অঞ্চল পার হয়ে ইসলাম উপাসকদের দেশে যেতে হয়–'

রাতটা কাটাতে হবে দৈববাণী শোনার জন্য।

এবং মুম্বাটুর মুখ দেখে বুঝেছে, সিংহ শিকার করে ফিরতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তার উপজাতি সম্প্রদায় কতটা তাকে মান্য করবে কে জানে! শুধু এটা বীরত্বের প্রকাশ হলেও কথা ছিল। উপজাতিরা মনে করে সিংহ বনের আদি বাসিন্দা। সে বনের মংগল চায়। যদি সিংহ শিকার করে না আনতে পারে তবে তার আত্মা মুম্বাটুর হয়ে দিনরাত পাহারা দেবে না। খরা, বন্যা আছে– আছে মড়ক, এ-সবের জন্যও ফনকে সিংহ শিকার করে ফিরতে হয়। হয় সিংহের আত্মা নিয়ে এসে সুখে রাজ্য চালাতে হবে, নয় সিংহের পেটে চলে যাওয়া অনেক বেশি সুখের। তার জন্য একটি উপজাতি নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধর্মীয় বোধের অভাবে তার সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে–এ-সব চিন্তাভাবনায় মুম্বাটুর মাথা ঠিক নাও থাকতে পারে।

ফলে ম্যান্ডেলা রাতেই পালকের টুপি পরে সেই জনপদের উপর ভেসে বেড়াতে বাধ্য হলো। কারণ দৈববাণী না হলে মুম্বাটুর রক্ষা নেই।

আর দৈববাণী হতেই লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছে।

আর ঘণ্টা বাজছে আকাশে।

ম্যান্ডেলা নিচে নেমে আবার বাতাস কাটিয়ে বিশাল বাওবাব এবং তুঁতেগাছের

পাশ দিয়ে উড়ে এল ফনের প্রাসাদের কাছে। সব রমণীরা কোমরে উটের পালক পরে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

জ্যোৎস্না রাত বলে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—গাঁয়ের সব মানুষ ঘরের বাইরে, অথবা টিলার উপরে—কালাবাস বাজছে। দূর দূর জঙ্গল থেকে মশাল জ্বালিয়ে নেমে আসছে কাফ্রি পুরুষ-রমণীরা। তারা সংকেত থেকে জানতে পেরেছে, আকাশে দৈববাণী হবে—কারণ, এই বার্তা রটে গেলে কে আর স্থির থাকতে পারে—স্থির থাকাই কঠিন। দৈববাণী বড় মহৎ খবর। মানুষের মঙ্গলের জন্যই দৈববাণী হয়ে থাকে। যীশুর পূর্বপুরুষ মোজেসও দৈববাণী শুনেই সমুদ্রে নেমে গেছিলেন—জল দু-ভাগ হয়ে গেল। মোজেস তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন। শত্রুরা পেছনে তাড়া করছে। তাড়া করলে সমুদ্র শুনবে কেন! দৈববাণী বলে কথা! সমুদ্র দৈববাণীর বশ। মোজেসকে পার করে দিতে পারে, পথ করে দিতে পারে। তাই বলে মোজেসের শত্রুরা তো কোনো দৈববাণী শোনেনি। সমুদ্রে তারা নেমে গেল ঠিক—তবে তারা জলে ডুবে গেল। সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে মোজেস দেখলেন, এবং লাঠি তুলে দিতেই সমুদ্র এক হয়ে গেল। দৈববাণী এ-রকমেই হয়। ঈশ্বরের নির্দেশ বলে কথা! ফন প্রাসাদের ভিতর একটা বড় কাঠের গুঁড়িতে বসেছিলেন। আকাশে ঘণ্টা বাজতেই উঠে দাঁড়ালেন।

ম্যান্ডেলা আকাশে উড়ছে।

ঠিক প্রাসাদের চারপাশে উড়ছে।

এবং লোকজন সব টিলায় উঠে এলে ম্যান্ডেলা বুঝল, অধীর আগ্রহে তার কথা শোনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

হাইতিতি আবার জ্বালাতে শুরু করেছে। জঙ্গলে জোনাকি পোকার উপদ্রব আছে। জোনাকি পোকা ধরে পাখা ছিঁড়ে দেবার স্বভাব হাইতিতির। ও না উড়লে তো আকাশে ঘণ্টা বাজবে না!

ওর গলাতেই তো জাদুকরের রুপোর ঘণ্টা।

ম্যান্ডেলা বলল, 'সিংহ শিকার নয়। বরং আমি দৈববাণী করছি, ফন। একটি আস্ত জ্যান্ত সিংহ ধরে আনুন। ঈশ্বর আপনাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।'

মুম্বাটু চিৎকার করে বলছে, 'এটা কী বলছেন দেবী। জ্যান্ত সিংহ ধরা যায়!'

'যা বলছি, ঠিক বলছি। ফন,আশা করি আপনার বনভূমির জীবজন্তুদের ভালোবাসবেন। অকারণ জীবহত্যা পাপ।'

'পাপ!'

'হ্যাঁ, পাপ।'

'মানুষ হত্যা আরও পাপ।'

'করোটি ঘরের দরজা থেকে সরিয়ে দিন!'

মুম্বাটু বলছে, 'দেবী, জাতি যে পরম বিপদে পড়ে যাবে।'

'যাবে না। ইসলাম উপাসক দেশ থেকে চাষ-আবাদ ভালো করে শিখে আসুন। ভালো আবাদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।'

বাঁচতে পারে না। প্রতিধ্বনি উঠছে পাহাড়ে পাহাড়ে।

'ঘোস্ট-হাউজ পুড়িয়ে দিন। পূর্বপুরুষদের আত্মারা কেউ ঘোস্ট-হাউজে নেই। অকারণ ওখানে মোষ, গরু উৎসর্গ করা হয়। বন্ধ করুন সব।'

মুম্বাটু হতবাক। সিংহ শিকার সোজা! তাকে জ্যান্ত কব্জা করা যায় না। অথচ দেবী দৈববাণী করলেন, জ্যান্ত সিংহ ধরে আনুন। ভালোবাসুন। তবে তারা বুঝবে আপনার রাজত্বে তারা নিরাপদ।

আসলে ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি বিকেলেই ফনের অতিথিশালা থেকে বের হয়ে গেছিল। তার তো আর সবাইকে বলে বের হতে হয় না। শুধু মুম্বাটুকে জানিয়েছে, একবার বিকেলে আমরা ঘুরে আসব। ভয় নেই, চলে যাব না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কারো ঘোর বিপদ।

মুম্বাটু বলল, 'আজ তবে দৈববাণী হচ্ছে না।'

'না, তা হবে। রাতেই ফিরে আসব। হাইতিতির যখন এতই আনারস খাওয়ার শখ, দেখি তা পাওয়া যায় কিনা।'

বিকেলে বের হবার আগে উপজাতির ফন মুম্বাটুর সঙ্গে এমন কথা হয়েছিল!

ঘোর বিপদটা কি বুঝতে পারছে না মুম্বাটু। কার বিপদ! ম্যান্ডেলার মা'র, কিংবা মামার। ওর বাবা তো নিখোঁজ। নিখোঁজ বাবাকে খুঁজে বেড়াবার জন্যই তো জাদুকর তাকে পালকের টুপি দিয়েছে। বাবার খোঁজে বের হয়ে সে নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। একবার কোথায় নির্জন এক দ্বীপে একজন পলাতক সেনার দেখা পেয়েছিল। সে জানতই না, যুদ্ধ থেমে গেছে। অবশ্য মুম্বাটুরাও জানত না, সেই যুদ্ধের কথা। ওদের যুদ্ধ বড়জোর তীর-ধনুকের। বর্শার লড়াই। এবং মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ম্যান্ডেলা বলেছে, 'ধুস, তুমি মুম্বাটু কিছু জান না। যুদ্ধে ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, বোমারু বিমান, যুদ্ধজাহাজ, হাজার হাজার যুদ্ধজাহাজ, একটা যুদ্ধজাহাজ না, হাজার হাজার যুদ্ধজাহাজ, হাজার হাজার বোমারু বিমান—তুমি সে যুদ্ধের খবর জানই না। আমিও না। আমি তো তখন জন্মাইনি। বুচার মামা সব জানে।

তুমি জান মুম্বাটু, সেই পলাতক সৈনিক বুড়ো হয়ে গেছে, পাতার পোশাক পরে, দ্বীপের গাছে থাকে, প্রজাপতিরা তার বন্ধু। কচ্ছপের ডিম সে পুড়িয়ে খায়। পাখিরা তার মাথার উপর বিকেলে নেচে বেড়ায়। সে সমুদ্রের ধারে চুপচাপ একা বসে থাকে।

জান মুম্বাটু, ওর একজন মেয়ে আছে। ওর স্ত্রী আছে। ওর বাড়ির পাশে একটা নদীও আছে। অথচ দ্বীপে থাকতে থাকতে সবার কথা ভুলে গেছে। আমাকে দেখেই নাকি তার মনে হয়েছিল, আরে তারও তো মেয়ে আছে।'

মুম্বাটুকে বলেছিল, 'আমি না গেলে জান, সে মনেই করতে পারত না, তার বৌ'র কথা, মেয়ের কথা, গাঁয়ের কথা। মেয়ের গল্প বলতে বলতে কেঁদে ফেলত। তারপর জান, আমি বললাম, ঠিক আছে জাহাজ পাঠিয়ে দেব—তুমি দেশে চলে যেও।'

মুম্বাটু অবিশ্বাস করত না। ম্যান্ডেলা পারে না, হয় না। যার মাথায় একজন ইন্ডিয়ার জাদুকর হাত রেখেছে, সে সব পারে। এবং ম্যান্ডেলা অনায়াসে একটা জাহাজ পাঠিয়ে দিতে পারে। বুড়ো মানুষটার দেশে ফেরা বড় দরকার।

আর এটা ম্যান্ডেলার বোকামি। কী দরকার ছিল বলার, যুদ্ধ তো কবে শেষ। তোমার মেয়ে কি তোমাকে চিনতে পারবে! তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। সাদা দাড়ি। তখন তো জোয়ান ছিলে, তাই না! তোমার মেয়ে ভয় পেলে বলবে, আমি

হানস ওটো। চিনতে পারছ না?

দ্বীপে থাকতে থাকতে বুড়ো তার নামও ভুলে গেছিল। ম্যান্ডেলাকে দেখার পরই তার নাম মনে পড়ে যায়। গাঁয়ের নাম, নদীর নাম, মেয়ের নাম সব। নির্জন দ্বীপে সে আর তার প্রিয় পাখি, প্রজাপতিরা, কচ্ছপেরাও থাকে। মাঝে মাঝে সে একা হেঁটে যায়, কখনও নির্জন দ্বীপের টিলার উপরে শীতের দিনে আগুন জ্বালে, সে পাতার পোশাক পরে—ম্যান্ডেলা তার বাবাকে খুঁজতে গিয়ে হানসকে খুঁজে পেয়েছিল। হানস যে তার বাবা নয়, সাদা দাড়ি দেখে বুঝেছিল, এবং পাতার পোশাক পরে হানস হেঁটে গেলে রাজার মতো মনে হতো।

সেই হানসকে শেষ পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সাদা জাহাজ দ্বীপে ভিড়েছে। কাপ্তান, চিফ অফিসার, সারেঙ সবাই নেমে এসেছিল। ডাকছিল,'হানস ওটো।' কারো সাড়া নেই। ম্যান্ডেলা কাপ্তানকে বলেছিল, 'এই দ্যাখ, আগুন জ্বেলে এখানটায় হানস ওটো বসেছিল।'

'এই দেখ ওর গাছ। গাছের ডালে তার বাড়িঘর।'

'এই দ্যাখ তার পোশাক।'

'এই দেখ এখানে তার পায়ের ছাপ।'

'এখানে সেই গাছ, দ্যাখ ওর নাম, গাঁয়ের নাম, নদীর নাম লেখা আছে।'

'কালও সে এখানটায় ছিল।'

'সে আমাকে কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে খাইয়েছে। মধু খাইয়েছে। ভারি সুস্বাদু খাবার।'

'পাখির লালা থেকে বাসা তৈরি হয় জান! দেখ, এদিকটায় এস। লালার বাসা জলে ভিজিয়ে সুপ করে দিয়েছে, জান!'

ম্যান্ডেলা কাপ্তানকে সেই পাহাড়ের ঢালুতে হাত ধরে নিয়ে গেছিল। আসলে কাপ্তান তো ভাবতে পারে—মেয়েটা মিছে কথা বলে তাদের প্রতারণা করেছে। তবে মেয়েটাকে সমীহ করে কাপ্তান। কারণ জাহাজে নানা উৎপাত এমনিতেই থাকে। ভূতের উৎপাতও থাকে। লাউঞ্জ থেকে সুপের প্লেট যদি বাতাসে ভেসে চলে যেতে থাকে কে না ভয় পায়! পালকের গুণ—ম্যান্ডেলা জাহাজের সব অফিসারদের মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল যে ভয়ে রাজী হয়ে গেছে। হানস ওটোকে দেশে পৌঁছে দেবে বলতেই ম্যান্ডেলা পালকের টুপি খুলে বলেছিল, 'আমি ম্যান্ডেলা। বাবার জাহাজডুবি হয়েছে, কোনো খবর নেই। জাদুকর পালকের টুপি দিয়ে গেছে। ওটা পরলেই বাতাসে ভেসে যেতে পারি, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। আমি তোমাদের সঙ্গে মিছে কথা বলতে যাব কেন?'

ম্যান্ডেলা নিজেই বোকা বনে গেছিল। সে রাতে কথা বলে গেছে হানস ওটোর সঙ্গে। বলেছে, 'সাদা জাহাজ আসবে, ওতে উঠে দেশে চলে যেও।' তারপর সে উড়ে যাচ্ছে সমুদ্রে—যদি কোনো জাহাজের খোঁজ পায়। জাহাজ পেল, তারা ম্যান্ডেলাকে বিশ্বাস করে হানস ওটোকে উদ্ধার করতে এল—অথচ তার আর পাত্তা নেই। সব আছে—এমন কি তার প্রিয় পাতার পোশাকও আছে, অথচ সে নেই।

আসলে ম্যান্ডেলা বুঝবে কি করে হানস রাতে তার মত পাল্টে ফেলেছে। পাখিরা এসে বলল,'তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে, খারাপ লাগবে না।'

প্রজাপতিরা বলল, 'হানস, তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে! খারাপ লাগবে না!'

হানসেরও কি মনে হয়েছিল, কে জানে! সে বলল, 'কোথায় লুকাই বল তো! জাহাজ তো আসছে। মেয়েটা জাহাজে খবর পৌঁছে দিয়েছে।'

প্রজাপতিরা বলল, 'তুমি বসে পড়।'

'দ্বীপের ঝোপ-জঙ্গল হয়ে যাও।' পাখিরা বলল।

হানস ওটো বসে পড়ল। অজস্র প্রজাপতি উড়ে এসে তার গায়ে বসে গেল। ঠিক বসে পড়ল বললে ভুল হবে। সে দু'হাত দু'দিকে বিস্তার করে কেমন যীশুর মতো মাথা এলিয়ে দিয়েছিল। সারা গায়ে প্রজাপতি বসে গেছে। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা পাথরের মূর্তির মতো।

কেউ বুঝল না, ওই হানস ওটো।

সে দ্বীপে গাছ হয়ে বাঁচতে চায়।

সে দ্বীপ ছেড়ে যেতে চায় না।

ছোট্ট দ্বীপে কেউ তাকে খুঁজে পেল না। ম্যান্ডেলা উড়ে এসে টের পেল হানস ওটো দ্বীপে গাছ হয়ে গেছে। গাছ হয়ে গেলে তাকে আর বোঝায় কি করে! ম্যান্ডেলারও মনে হয়েছিল, সে এই দ্বীপেই ভালো থাকবে। সে টের পেয়েও কাপ্তানকে কোনো কথা বলল না।

সে শুধু বলল, 'হানসকে পাখি প্রজাপতিরা ডেকে নিয়ে গেছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

তারপর উড়ে চলে গেলে কাপ্তান শুনল, আকাশে সেই ঘণ্টা বাজছে। যেন বলছে, যে যেমনভাবে বাঁচতে ভালোবাসে, তাকে সে-ভাবেই বাঁচতে দাও। তাকে আর খোঁজা ঠিক হবে না।

মুম্বাটু এমন কত গল্প শুনেছে ম্যান্ডেলার মুখে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। সামান্য বালিকা যে ম্যান্ডেলা নয়, তার বুঝতে দেরি হয়নি। তারপর সে নিজেও ম্যান্ডেলার অলৌকিক কান্ড-কারখানায় মুগ্ধ। দৈববাণী যাই হোক, ম্যান্ডেলা তার মঙ্গলই চায়। যদি জ্যান্ত সিংহ ধরে আনতে পারে তবে আর এক বীরত্বের খবর তার উপজাতিদের মধ্যে প্রচার হবে। কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না তার রাজত্বকালে।

চতুর ফন গজিয়ে উঠতে পারবে না।

চতুর পুরোহিতও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। তার অমঙ্গল হয়, ম্যান্ডেলা এমন কিছু করবে না।

সে দেখল, আকাশ নীল। কিছু নক্ষত্র ফুটে আছে। আলিপাস গাছগুলি থেকে কিছু বাদুড় উড়ে গেল, ট্যাঙ্গার জঙ্গলে। হায়নারা ডেকে বেড়াচ্ছে। এবং মনে হলো শকুনি-গৃধিনীরা গাছের মগডালে বসে আছে কোনো মড়কের আশায়।

বন-জঙ্গলে বাস করতে গেলে এমন সব কত উপদ্রব থাকে। সকালে দূরের অরণ্যে শকুনের ঝাঁক উড়লেই তারা টের পায়, হিংস্র জন্তুর শিকারের লোভে শকুনেরা ওড়াউড়ি শুরু করেছে। হিংস্র চিতা বন্যজন্তু শিকার করবেই। হাতির কপালে থাবা বসিয়ে দেয়। বিশাল হাতির সে আর্তনাদে সারা বন কেঁপে ওঠে। হাতি দৌড়াবার চেষ্টা করে। শুঁড় দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধূর্ত চিতা থাবা বসিয়ে দিয়েছে কপালে। ধারালো দাঁতে ফালা ফালা করে ফেলছে মুন্ডু। মগজ চুষে খাচ্ছে। তারপর হাতিটা দুমড়ে মুচড়ে জঙ্গলের মধ্যে অতিকায় ঢিবির মতো পড়ে থাকবে। চিতা তার শিকার ফেলে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবে। হায়না, শিয়াল, কাক এবং শকুনেরা তখন ভোজের আশায়। শিয়াল, হায়না খায়, এক খাবলা মাংস নিয়ে টানাটানি করে—চিতা ছুটে এলে তারা পালায়। দিনের পর দিন এই আহারপর্ব

তারা যে কত বার দেখেছে! শকুনেরাও মাঠে বসে থাকে কাছে দূরে। এবং তারাও উড়ে এসে চিতার শিকারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করে।

মুম্বাটু বড় হবার মুখে এমন সব দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু ম্যাণ্ডেলা আকাশে ওড়ার সময়, হায়নার আর্তনাদ শুনতে পেল কেন বুঝতে পারছে না। ম্যাণ্ডেলা যে আকাশে উড়ছে, টের পায় ঘণ্টা বাজলে। হাইতিতিও সংগে ওড়াউড়ি করে। কিছু তো দেখা যায় না। কেবল ঘণ্টাধ্বনি থেকেই টের পায়, আসলে দৈববাণী করছে ম্যাণ্ডেলা। জ্যান্ত সিংহ ধরে আনা খুব কঠিন না। ফাঁদ পেতে ধরে আনা যায়। ফাঁদ পাতলে চাতুরি প্রকাশ পেতে পারে, বীরত্ব থাকে না।

হয়তো পূর্বতন ফনেরা চাতুরির আশ্রয় নিয়েই জংগল থেকে একা সিংহ শিকার করে ফিরেছে। সিংহের হাঁ-করা মুখে বল্লম গাঁথা। সামনা-সামনির লড়াই হয়েছে এতে বোঝা যায়। পেছন থেকে চোরাগোপ্তা হানায় সিংহ শিকার করা খুব কঠিন না। তাতে অমর্যাদা, ভীরু কাপুরুষ—তার সম্প্রদায়ের মানুষরা ফন ভীরু কাপুরুষ ভাবলেই গেছে। তার কেন যে মনে হলো, আসলে পূর্বতন ফনেরা ছিল ধূর্ত। সব ফনেদের বিশ্বস্ত অনুচরের অভাব থাকে না। গোপনে তারা জংগলে গেছে। মাটি তুলে গাছ পাতা উপরে বিছিয়ে ফাঁদ তৈরি করেছে। তারপর পোষা মোষ বেঁধে দিয়েছে। পশুরাজ নিশ্চিন্তে ছুটে এসে ঘাড় কামড়ে ধরলেই হুড়োহুড়ি। আর পাশেই তৈরি কৃত্রিম খাদে শিকারসহ পশুরাজ বন্দী। তখন সেই আটক সিংহের মুখে বল্লম ছুঁড়ে দেওয়া খুব কঠিন কাজ না। বিশ্বস্ত অনুচরেরা টেনে-হিঁচড়ে পশুরাজকে জংগলের বাইরে ঘাসের জংগলে ফেলে রেখে হয়তো চলে যেত। তারপরই কালাবাস পিটিয়ে দেওয়া হতো। রক্তাক্ত ফন ফিরছেন। তাঁর অনুচরেরা ফনের শিকার নিয়ে ফিরছে। চার পা বাঁধা জন্তুটাকে দশ-বারজন কাফ্রি ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে।

মুম্বাটু বুঝতে পারে রাজত্ব রক্ষা করতে পূর্বতন ফনেরা এ-ধরনের চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু সে তো চাতুরি জানে না। সে যাবে এবং চেষ্টা করবে, একজন বীর যেমন চেষ্টা করে—সিংহের গুহা খুঁজে বের করাই প্রাণান্ত। তার উপর ওর সাংগোপাংগরও অভাব নেই। দুশ্চিন্তায় সে ক'রাত ঘুমাতে পারেনি, তবু মনে হয়েছিল, সে একজন বীর। বীরত্ব তার ধমনীর রক্তে। সে পারবে। কিন্তু দৈববাণী তাকে কিছুটা বিবশ করে দিয়েছে, একটা জ্যান্ত হিংস্র পশুকে কব্জা করবে কিভাবে! সিংহ শিকার সম্ভব কিন্তু জ্যান্ত ধরে আনা বড় অবাস্তব ঘটনা।

অথচ সে জেনেছে, কেউ বলে গেছে তাকে, ঘোর বিপদ।

ঘোর বিপদটা কি বুঝতে পারছে না।

তার জনপদ এখন খাঁ খাঁ করছে। কিছু অনুচর তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সে চলে যেতে বলল। তারপর একা নির্জন রাতে প্রাসাদের বাইরে এসে সাধারণ পোশাকে অতিথিশালায় ঢুকে দেখল ম্যাণ্ডেলা ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডাকতে সাহস পেল না। দরজায় চুপচাপ অত্যন্ত গোবেচারা হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে থাকল।

ঘরে এক কোনায় ছোট্ট মশাল জ্বালানো। মাটির দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশ-বেতের জানালা। ঘরের মেঝে মাটির এবং নিকানো। হাইতিতি ম্যাণ্ডেলার পায়ের কাছে শুয়ে আছে। পিটপিট করে দেখছে মুম্বাটুকে। অসময়ে মুম্বাটুকে দেখে খুশি না বোঝাই যায়। যেন সে কিছু অপরাধ করলে সংগে সংগে ঘণ্টা বেজে উঠবে।

তার এই সতর্কতা কেন মুম্বাটু বোঝে। হাইতিতি বন-জংগলের সব হদিস রাখে। সে হয়তো গাছপাতার গন্ধে টের পায়—কোন বনে কি জন্তুরা ঘোরাফেরা করে। সে হয়তো ভালোই জানে সেটা। এমন চতুষ্পদ জীব সে কখনও দেখেনি। সামনের পা দুটো বেশ ছোট। পেছনের পা দুটো এতই লম্বা যে ইচ্ছা করলে, যে কোনো প্রাণীর চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে। তবে সে দেখেছে হাইতিতি লেজের উপর ভর করেই চলাফেরা করতে বেশি পছন্দ করে। লেজে দারুণ জোর এও টের পেয়েছে।

সে নিরীহ গোবেচারা স্বভাবের। তার পক্ষে কোনো খারাপ কাজ করাই কঠিন। তবু ম্যাণ্ডেলা পরীদের মতো সুন্দর দেখতে। কাছে থাকলে মায়া জানে। সে যে তাকে কপালে হাত রেখে জাগিয়ে দেবে তারও সাহস নেই। কিসে কি হয় তার জানা নেই। গায়ের রঙ হাতির দাঁতের মতো সাদা। আর মাখনের মতো নরম শরীর। বড় কোমল প্রাণ। তা-ছাড়া যার বাবা নিখোঁজ তার তো অনেক কষ্ট। না হলে, কে আসে এমন তেপান্তরের দেশে বাবাকে খুঁজতে। সে ভাবছে—ঘোর বিপদটা কার।

ম্যাণ্ডেলা টের পায় সব। সুতরাং জানতে এসেছে, ম্যাণ্ডেলা যদি জানে ঘোর বিপদ কার! যদি বলে দেয়, ভয়ে সে সতর্ক থাকতে পারে। ঘোর বিপদ তারও হতে পারে। সেই ভেবেই চলে আসা। আসার সময়, একজন সাধারণ মানুষের মতো হেঁটে এসেছে। হাতে বল্লম নেই, কাঁধে তীর-ধনুক নেই। এমন কি সে যে কাঠের জুতো পরে থাকে, তাও পায়ে নেই। এতই সন্তর্পণে সে অতিথিশালায় নিশুতি রাতে হাজির।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ম্যাণ্ডেলা দেখল, মুম্বাটু হাঁটু মুড়ে তার দরজায় বসে আছে।

ইস্‌, মুম্বাটুটা যে কি!

তার লোকেরা এ-ভাবে বসে থাকতে দেখলে, বুঝবে, সে ফন হবার উপযুক্ত নয়। একজন ফনের কত দাসদাসী, কত অনুচর। ঘুম ভাঙলে, তার পায়ের কাছে কাফ্রি যুবতীর হাতে কাঠের পরাত। হাত-মুখ ধোয়ার জল। তুঁতে গাছ থেকে রেশমের গুটি—গুটি থেকে সুতো, সেই সুতোর পোশাক শরীরে। সে জেগে গেলে, বাইরে শিংগা ফুঁকে দেওয়া হয়—কালাবাস পেটানো হয়। ফন জেগেছেন বলা হয়। ফন জেগে গেলেই দূরে দূরে খবর হয়ে যায়। তিনি জেগেছেন। তিনি খাচ্ছেন। তাঁর তখন মধ্যাহ্নভোজের সময়। হরিণের মাংস সেদ্ধ, কিংবা কাঠে পোড়ানো হরিণের নরম মাংস, আর আপেল আঙুর এ-সব তো থাকেই। সেই ফন দরজায় এ-ভাবে বসে থাকলে ভয়ের কথা!

ম্যাণ্ডেলা বলল, 'মুম্বাটু, তোমার তো দেখছি আক্কেল নেই। তুমি রাজত্ব করবে কি করে!'

'আমার যে ঘোর বিপদ। রাতে ঘুম হয়নি। জ্যান্ত সিংহ পাব কোথায়? তার চেয়ে বল, চলে যাই জংগলে। হিংস্র বন্যপ্রাণীরা আমাকে খেয়ে ফেলুক।

দৈববাণী সত্য না হলে, আমাকে এরা এমনিতেই মেরে ফেলবে। তারপর কেটেকুটে কলাপাতায় হাত-পা-মুণ্ডু বিছিয়ে নিয়ে যাবে বনের দেবতাকে তুষ্ট করতে।

ম্যাণ্ডেলার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আসলে সে কাল উড়তে উড়তে দেখতে পেয়েছে, একটা বুড়ো সিংহ বিশাল একটা পাথরে লাফ দিয়ে উঠে গেছে। একদল হায়না বুড়ো সিংহটাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। প্রাণের ভয়ে পশুরাজ পাথরের ওপর বসে লেজ নাড়ছে। নেকড়েরা আক্রমণ করতে আসলে থাবা মারছে। তার যে দ্রুত দৌড়াবার ক্ষমতা নেই ম্যাণ্ডেলা কাছে গিয়ে টের পেয়েছিল। থাবার নখ ভোঁতা। ক্ষয়ে গেছে। ঠিক টের পেয়েছে ধূর্ত নেকড়ের দল, বুড়ো ভাম দলছাড়া। দল থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাণ্ডেলা দেখে নিল, আকাশে শকুন উড়ছে। ওরা ঠিক টের পায়, বুড়ো পশুরাজের নিস্তার নেই। তার শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নেবে নেকড়েগুলি। আত্মরক্ষার্থে একটা টিলার উপর কালো পাথরে বসে আছে। তিন দিক থেকে নেকড়ের দল ছেঁকে ধরেছে। নেমে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিচ থেকে এত চিৎকার করছে সমস্বরে যে কানে তালা লেগে যায়। কি বিকট মুখ-চোখ জ্বলছে! আর ক্ষুধায় তেষ্টায় বুড়ো ভামকে পাথর থেকে নেমে আসতেই হবে। পাথরটায় কোনোরকমে শরীর রাখা যায়। পেছনে গেলেই মরণফাঁদ। বিশাল খাদে পড়ে যাবে বুড়ো ভাম টের পেয়েছে। ম্যাণ্ডেলার কেন যে মনে হয়েছিল, বুড়ো ভামই যেন তার নাম হতে পারে। তার জীবনান্ত হবে ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেছিল।

মুম্বাটু হাঁটু মুড়ে দরজার পাশে বসে আছে

ঘোর বিপদের কথা সেই বলেছে।

তার মনে পড়ল, সেই যেন উচ্চারণ করেছে, ঘোর বিপদ। সে জানে না, তার বাবাও এমন বন্দীদশায় দিন কাটাচ্ছে কিনা! কারো কোনো কষ্ট দেখলে নিখোঁজ বাবার কথাই মনে হয় শুধু। কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে, জাহাজডুবি হলে, সাঁতরে সমুদ্র পার হওয়া কত কঠিন, সে এতদিনে তা বুঝে ফেলেছে। বসন্তনিবাস তো পালকটা তাকে না দিয়ে বাবাকে দিতে পারত। সে যে কোথায় খুঁজবে! বসন্তনিবাস তো বলে গেছে, খোঁজ, পেয়ে যাবে। যতদিন খুঁজে না পাবে, পালকটা তোমার। খুঁজে পেলেই পালকটা তোমার হারিয়ে যাবে। খুঁজে পেলেই তুমি বড় হয়ে যাবে। সাদা ফ্রক পরা বালিকা আর থাকবে না।

বাবার কথা ভাবলেই চোখে জল চলে আসে। বুড়ো ভামকে দেখেও চোখে জল এসে গেছিল। হানস ওটোকে দেখেও চোখে জল এসে গেছিল। তার বাবাও হয়তো জাহাজডুবির পর কোনো নির্জন দ্বীপে উঠে আশ্রয় নিয়েছে। এতদিনে হয়তো পাতার পোশাক বানিয়ে ফেলেছে। ডলফিন, কচ্ছপ, কাঁকড়ারা সব তার বন্ধু। পাখিরা উড়ে আসছে তার মাথার উপর, কোনো বড় গাছে, বাবা তার নিজের নাম লিখে রেখেছে। তার নামও লিখে রাখতে পারে। নদীর নাম, গাঁয়ের নাম লিখে রেখে একদিন সেই বুড়ো মানুষটার মতোই দ্বীপে একটা গাছ হয়ে যাবে। কাছে গেলেও তাকে আর চিনতে পারবে না।

মুম্বাটু বলল, 'ম্যাণ্ডেলা, তুমি কাঁদছ কেন!'

'কৈ কাঁদলাম।' সে তার চোখ মুছে বলল, 'তোমার এ-ভাবে আসা উচিত হয়নি।' তারপর সে পাহাড়ে আটক বুড়ো ভামের কথা বলল। তাকে কি-ভাবে রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তায় সে রাতে ভালো ঘুমাতেও পারেনি। তার যেন জ্যান্ত সিংহ ধরে আনা ছাড়া অন্য কোনো দৈববাণী মাথায়ও আসছিল না।

আসলে ম্যাণ্ডেলা এ-ভাবেই জড়িয়ে যায়। যেমন মুম্বাটুর জন্যও তার কষ্ট কম ছিল না। এমন সরল বালক সে কমই দেখেছে। তার নিরুপায় দাদুর চোখে জল দেখেই টের পেয়েছিল, মুম্বাটুকে যে

করেই হোক বাঁচাতে হবে। সে কথাও দিয়েছিল। তারপর যা গেছে, ভাবলে বুক এখনও কাঁপে। তবে সে জানে জাদুকর বসন্তনিবাস তার সহায়। সে খুশিমতো উড়তে পারে, অদৃশ্য হতে পারে। মশাল নিয়ে সে উড়ে উড়ে খেলা দেখাতেই ভিড় পাতলা। একটা মশাল যদি বাতাসে ভেসে বেড়ায়, অদৃশ্য বালিকা যে মশাল হাতে নিয়ে আকাশে উড়ছে বুঝবে কী করে! ওঝা, গুণিন এবং পুরোহিতের চক্ষুস্থির। অগ্নিকুণ্ডে হেঁটে যাবার মুখেই সে মশালগুলো তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল। পুড়ে মরেছিল ওঝা, গুণিন। এই অপদেবতা কে সেই ভয়ে প্রাণের মায়ায় ছুটতে গিয়ে খাদের নিচে গড়িয়ে পড়েছিল পুরোহিত।

কিন্তু এখন বুড়ো ভামকে নিয়ে কি করা যাবে! সেই ভাবনাতেই সে অস্থির।

ম্যাণ্ডেলা বলল, 'মুম্বাটু, তুমি বের হবে না। হাইতিতি যাক। প্রাসাদ থেকে রাজপোশাক তোমার নিয়ে আসুক। তোমার অনুচরদের বল, ঘোড়া দুটো নিয়ে আসুক। আমরা বের হব।'

'ঘোড়ায় চড়তে পারবে তো?' ম্যাণ্ডেলার ফের প্রশ্ন।

মুম্বাটু ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।

তারপর রাজপোশাক পরে মুম্বাটু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ম্যাণ্ডেলা ঘোড়ার পিঠে আগে আগে যাচ্ছে। ঘাসের প্রান্তর পার হয়ে তারা চলে গেল। সামনের পাহাড়ে উঠে গিয়ে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ!'

পাশাপাশি দু'জন ঘোড়ার পিঠে।

মুম্বাটু বলল, 'কোন দিকে?'

'শুনতে পাচ্ছ না হায়নারা চিৎকার করছে।'

মুম্বাটু সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারপরই ম্যাণ্ডেলার কি হলো কে জানে—আকাশে হাইতিতি উড়ছে। ঘণ্টা বাজলেই টের পায় ঠিক মাথার উপরেই আছে হাইতিতি। ম্যাণ্ডেলা ইশারা করতেই হাইতিতি তার কাছে নেমে এল। কী যেন বলবে, মনে করতে পারছে না, আরে সে ভুলে যাচ্ছে কেন! ঐ তো দূরে পাথরে বুড়ো ভাম আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করছে।

ওরা আরও এগিয়ে গেল। আকাশিয়ার জঙ্গল শুধু কাঁটাঝোপ। ঝোপ অতিক্রম করতেই দেখল, হায়নার দল প্রায় কাবু করে ফেলেছে সিংহটাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে হায়নারা উঠে আসছে, শিকার কবজায় টের পেয়ে গেছে সবাই। বুড়ো ভাম থাবা উঁচিয়ে আত্মরক্ষা করছে—মেঘের গর্জন যেন—অথচ হায়নারা এতটুকু সন্ত্রস্ত নয়।

ম্যাণ্ডেলা বলল, মুম্বাটু, আগুন জ্বালতে হবে।

মুম্বাটু তীর ছুঁড়তে গেলে ম্যাণ্ডেলা বাধা দিল। শিকারী তো শিকার খুঁজবেই। বুড়োকে বাগে পেয়ে ছেঁকে ধরেছে। ওদের দোষ কি। ওদেরও তো খেতে হবে।

মুম্বাটু ঠিক বুঝতে পারছে না, ম্যাণ্ডেলা আসলে কি চায়! হাইতিতিকে সে ডেকেছে, অথচ মনে করতে পারছে না কি বলবে! তারপরই মনে পড়ে গেল।

'আরে হাইতিতি, আবার দুষ্টুমি শুরু করলি! এখন কি মজা করার সময়। শীগগির মরা খরগোস দেখে নিয়ে আয়। অথবা যদি পারিস কোনো জীবজন্তুর হাড়টাড়।। যা পাস নিয়ে আসবি।'

হাইতিতি উড়তে থাকল। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা মুম্বাটু শুকনো ডালপাতা সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে দিতেই বিশাল এক অগ্নিশিখা আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকল। দাবাগ্নির মতো জ্বলে উঠেছে, আর হায়নার দল আগুন দেখেই ভড়কে গেল। ছুটে পালাচ্ছে সব।

ওরা ঘোড়া দুটোকে ঘাসের জমিতে ছেড়ে দিয়ে যত শুকনো ডালপালা পাচ্ছে, নিয়ে আসছে। ম্যাণ্ডেলা উড়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে—কিন্তু মুম্বাটু পারবে না। মুম্বাটু একা পড়ে গেলে আতঙ্কে পড়ে যেতে পারে। আর তখনই ফিরে এল হাইতিতি। চিতল হরিণের ঠ্যাং হাতে।

ম্যাণ্ডেলা বলল, 'মুম্বাটু, এবারে ঘোড়ায় উঠে বস। আমার ঘোড়াটা অনুসরণ করবে তোমাকে। দেখি বুড়ো ভামের কাছে গিয়ে।' বলে পালকের টুপি পরতেই অদৃশ্য। উড়ে উড়ে বুড়ো ভামের কাছে চলে গেল।

আর আশ্চর্য, মুম্বাটু দেখল চিতল হরিণের একখণ্ড হাড় মাংস বুড়ো ভামের মুখের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। খপ করে মাংসটা খেতে এলেই ওটা আবার কে সরিয়ে নিচ্ছে। বাতাসে ভেসে গিয়ে ম্যাণ্ডেলা হরিণের মাংসের লোভে ফেলে দিচ্ছে।

ক্ষুধার্ত সিংহ মরিয়া হয়ে উঠেছে একখণ্ড মাংসপিণ্ডের জন্য। কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না।

লোভে ফেলে দিচ্ছে ম্যাণ্ডেলা।

ম্যাণ্ডেলা তখন কি যে খেলা দেখাবে বুঝতে পারছে না মুম্বাটু।

লাফ দিয়ে নামল পাথর থেকে আর মাংসপিণ্ডের পেছনে ছুটতে থাকল বুড়ো ভাম। যেন বাতাসে উড়ে যাচ্ছে মাংসপিণ্ড। আর ক্ষুধার্ত সিংহ তাকে অনুসরণ করছে।

মুম্বাটু বুঝতে পারল, ম্যাণ্ডেলা ঐ মাংসপিণ্ডের লোভ দেখিয়ে তার প্রাসাদের কাছে নিয়ে যাবে বুড়ো ভামকে। তার প্রাসাদ সংলগ্ন আকাশিয়ার জঙ্গলে তুলে নিয়ে যেতে চায়। গড়ের মতো জায়গাটায় কোনো পশুরাজ ইচ্ছে করলেই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। এতটা উঁচুতে বন্য হিংস্র জন্তুরা উঠে আসতে সাহস পাবে না। কারণ তার নিচেই রোজ রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। বন্য হিংস্র জন্তুরা আগুনকে বড় ভয় পায়। বুড়ো হয়ে গেলে এই হয়। পশুরাজ দল থেকে নির্বাসিত।

উপজাতির লোকেরা দেখছে মুম্বাটু ঘোড়ায় ঘরে ফিরছে। অন্য ঘোড়াটা মুম্বাটুর পেছনে পেছনে আসছে। আর অবাক, তার পেছনে একটা জ্যান্ত সিংহ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসছে। থাবা চাটছে, কিছু মুখে দেবার চেষ্টা করছে, লাফ দিয়ে কিছু ধরতে চাইছে, অথচ পারছে না বলে ক্ষেপে যাচ্ছে। কোনোরকমে ক্রিলের মধ্যে ঢুকে গেলে উপজাতিরা ভয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। একটা জ্যান্ত সিংহ ক্রিলের মধ্যে ঢুকে গেছে, অথচ মুম্বাটু যেন এতটুকু শঙ্কিত নয়। সে বর্শা উঁচিয়ে ধরতেই লোকজন বুঝল, কোনো ভয় নেই। বর্শা উঁচিয়ে ধরলেই, নির্ভয় এমন জানে তারা। সবাই আবার জড় হতে থাকল।

মুম্বাটু বলল, 'পশুরাজ এসে গেছেন। তোমাদের কি শিকার আছে খেতে দাও। ধরে নিয়ে এলাম।'

উপজাতিরা জানে, তারা শিকার করেই জীবনধারণ করে। গতকাল দুটো কুমীর শিকার করা হয়েছিল বলং নদী থেকে। জাল পেতে কুমীর দুটোকে ফাঁদে ফেলেছে। কুমীরের মাংস কাটাকুটি হচ্ছিল। খবর পেয়ে মুম্বাটুর অনুচরেরা

তার পেছনে একটা জ্যান্ত সিংহ উঠে আসছে।

ছুটল, কুমীরের মাংস আনতে। এবং সিংহটার দিকে সেই মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিতে থাকল ম্যান্ডেলা।

ম্যান্ডেলা অদৃশ্য হয়ে আছে। উপজাতিরা দেখল মাংসের টুকরো বাতাসে ভেসে গিয়ে টপাটপ সিংহের মুখে পড়ছে। ক্ষুধার্ত হলে মানুষ কি জীবজন্তু কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে! এবং পাগলের মতো সিংহটা নাচানাচি শুরু করছিল। যেন এই এল মাংসপিন্ড, আবার এল মাংসপিন্ড। তারপর ধীরে ধীরে পেট ভরে গেলে সিংহটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল—বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। খিদের পর খেলে কার না ঘুম পায়।

সিংহ আর এখন হিংস্র নয়।

ম্যান্ডেলা অদৃশ্য হয়ে আছে এখনও। সে মুম্বাটুর কানে কানে বলল, 'এবারে কাছে যাও। ওকে আদর কর।' বুঝতে দাও, তোমরা ওর শত্রু নও। সে যদি এখানে আহার উত্তাপ আর আশ্রয় পায় তবে তোমার পোষ মেনে যাবে।

ইচ্ছা করলে রাজদরবারে ঢোকার সময় তাকে নিয়ে ঢুকতে পারবে। কুকুরের মতো তোমার সিংহাসনের পাশে বসে থাকবে। তোমার কেউ ক্ষতি করতে চাইলে, সে ঠিক ধরে ফেলবে। তাকে আস্ত ছিঁড়ে খাবে। বন্যজন্তুরাও ভালোবাসা বোঝে, জান! ক্যাঙারুর বাচ্চাটাকে দেখেছ, সে আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। তাকে যেখানেই ছেড়ে দিয়ে আসি, সে আবার চলে আসবে।

এই সিংহটাকে তুমি আর যেতে দিও না। তোমার কাছে থাকতে থাকতে বুঝবে সে নির্ভয়। তার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। তখন সে তোমাকে ফেলে কোথাও যাবে না। জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেও সে আবার তোমার কাছে চলে আসবে।'

সুতরাং সব দৈববাণী ফলে যেতে থাকল। ঘোস্ট-হাউজ ভেঙে দেওয়া হলো। তারা আর নরমাংস খাবে না বলল। ঘরের সামনে করোটি ঝুলিয়ে রাখবে না বলল। ম্যান্ডেলা নিশ্চিন্ত। সে বলল, 'মুম্বাটু, এবারে আমি যাই। দেখি বলং নদীর জাহাজঘাটায় বাবাকে খুঁজে পাই কিনা। তোমরা শান্তিতে থাক। ভালো করে চাষ-আবাদ শিখে নাও। তখন আর ক্ষুধার জন্য দল বেঁধে তোমাদের বন্যজন্তু শিকারে বের হতে হবে না।' বলে ম্যান্ডেলা উড়ে যেতে থাকল। হাইতিতিও। নীল আকাশে ঘণ্টা বাজছে।

ছবিঃ ধ্রুব রায়

নিজের দেশে ম্যাগুেলা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন কতকাল হয়ে গেল, ম্যাগুেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে কেবল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ-সাত দিনও হয়নি তবু কেন যে মনে হয় কত কাল! বেশিদিন সে তার মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এটাই হয়েছে তার ভারি জ্বালা। মা ঠিক ছটফট করছে। আবার উধাও মেয়েটা! যায় কোথায়! সে যে তার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে বের হয়ে কত দেশে চলে যায়, তা মা কিংবা বুচার মামা বিশ্বাস করবে কেন! সে বলেও না কিছু। চুপচাপ থাকে। আগে হম্বিতম্বি হতো। পুলিশ থেকে শহরের বড় বড় কাগজগুলিতে তার নিখোঁজ হবার খবর চলে যেত। সে ফিরে এলেই, হাজার প্রশ্ন। কোথায় গেছিলে, কে তোমাকে নিয়ে গেছিল? কোনো দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়ে যে সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, তাই বা বিশ্বাস করবে না কেন তারা!

তার তখন এক কথা, 'জানি না।'

'কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে, জান না।'

'না জানি না।'

'আরে বলছ কি, তুমি বাচ্চা মেয়ে, বোঝ না—তোমার পক্ষে কোথাও এতদিন পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়।'

ম্যাগুেলা সাড়া দিত না। করুক না বকবক, কতক্ষণ করতে পারে দেখা যাক। তবে এবারে বেশ ক'দিন সে ঘরছাড়া। উড়তে শুরু করলে তার এই হয়। ঘরবাড়ির কথা মনে থাকে না, মা-র কথা মনে থাকে না,এমনকি বুচার মামা যে তার এই বাঁদরামিতে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তাও সে গ্রাহ্য করে না। উড়তে উড়তে সে সেবারে ফনের রাজত্বে ঢুকে গেছিল। সে না থাকলে মুম্বাটুকে যে পুড়িয়ে মারা হতো, কেউ বিশ্বাস করবে না। মা না, মামা না, কেউ না। আর এসব বলে সে তার সেই জাদুকরকে ছোট করতে চায় না। জাদুকর তাকে পালকের টুপি না দিলে তার বাবাকে খুঁজে বের করাও মুশকিল। আর এমনভাবে ওড়ার আনন্দই বা সে পেত কোথায়!

সে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, এরা বুঝবে কি করে। জাহাজডুবি যে কোথায় হলো, এটাই সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ তলিয়ে গেলেও বোট থাকে জাহাজে—বাবা যে বোটে ভেসে পড়েনি কে বলবে! কোনো দ্বীপে কিংবা অরণ্যে বাবা তার বেঁচে আছে, কারণ মানুষের জন্য ঈশ্বর সর্বত্র বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তার সেই বুড়ো হানসের কথাও মনে হয়। মানুষটা নির্জন দ্বীপে কতকাল কাটিয়ে দিল—সেই কবে সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল, হানস ছিল একজন সৈনিক—সে যুদ্ধজাহাজ থেকে পালিয়ে একটা দ্বীপে উঠে গেছিল। পালিয়ে না, জাহাজটা ডুবে যাচ্ছিল—কি যে খবর, সে আর এখন মনে করতে পারছে না। উড়তে উড়তে কোনো নির্জন দ্বীপে কেউ চুপচাপ বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলে কার না বিশ্বাস হবে, নিশ্চয়ই সেই নিখোঁজ মানুষটি, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট মেয়ে ম্যাগুেলার কথা ভাবছে! কিংবা সমুদ্রের কোথাও যদি কোনো জাহাজ কিংবা জেলে নৌকোর সন্ধান পাওয়া যায়, সেই আশাতেও মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সে যাই হোক, ম্যাগুেলা দ্বীপে নেমে গেছিল। সঙ্গে তো হাইতিতি আছেই। সে কাছে গিয়ে দেখল, একজন বুড়ো মানুষ, চুল সব পেকে গেছে—সাদা দাড়ি, গায়ে পাতার পোশাক। তার বাবা নয় ঠিক, তবে মানুষটার জন্য কম তার ভোগান্তি হয়নি। এই আছে এই নেই, কারণ ম্যাগুেলা পালকের টুপি মাথায় দিলেই অদৃশ্য, খুলে ফেললে ম্যাগুেলা। হাইতিতি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার গলায় ঘণ্টা বাজছে। দ্বীপে কোনো ভুতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়েছে ভেবে লোকটা দৌড়াতে শুরু করেছিল। এতটুকুন দ্বীপে আর যে মানুষজন নেই, ম্যাগুেলা উড়তে উড়তে টের পেয়েছে—তারপর লোকটার কাছে গিয়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়েছে, তার নাম ম্যাগুেলা। সে থাকে নিউ প্লাইমাউথ শহরে। জাদুকর তাকে পালকের টুপি দেওয়ায় সে যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। সঙ্গে আছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা হাইতিতি—গলায় রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দিলে, সেও অদৃশ্য হয়ে যায়—উড়ে যায়। সে তো ছোট্ট মেয়ে—একা একা ঘুরতে ভয় পাবে বলেই, হাইতিতিকেও দয়াপরবশ হয়ে জাদুকর রুপোর ঘণ্টা দিয়ে গেছে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে, তার আর কোনো ভয় থাকে না।

বুড়ো মানুষটি কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না তাকে। এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে! বাধ্য হয়ে ম্যাগুেলা টুপি পরে দেখিয়েছে, খুলে দেখিয়েছে। হাইতিতি যে একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা তাও দেখিয়েছে। রুপোর ঘণ্টা খুলে নিতেই হাইতিতি লাফিয়ে পড়েছিল, একেবারে বুড়ো মানুষটির নাকের ডগায়। সে বিশ্বাসই করতে পারেনি, হাইতিতি একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, আর এত চতুর। সারা দ্বীপে ছুটে বেড়িয়েছিল—কিন্তু শত হলেও বুড়ো মানুষ, পারবে কেন—ক্লান্ত অবসন্ন বুড়ো মানুষটি পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়েছিল—আর হাঁপাচ্ছিল। তারপর যখন বুঝল, না, ম্যাগুেলা সত্যি সুন্দর ছোট্ট পরীর মতো একটা মেয়ে এবং হাইতিতিও সত্যি একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, তখন বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবই সম্ভব। মানুষ তার কতটুকু জানে।

সেই মানুষটি দ্বীপে থাকতে থাকতে তার নাম ভুলে গেছিল। দেশের নামও মনে ছিল না। দ্বীপে থাকে। কচ্ছপের খোলে জল ধরে রাখে। পাখিরা উড়ে আসে দ্বীপের পাহাড়ে। তারা সেখানে বাসা বানায় মুখের লালা দিয়ে। সেই বাসা বুড়ো মানুষটা জলে ভিজিয়ে খায়—খুবই উপাদেয় স্যুপ। বুড়ো মানুষটার পাতার ঘরেও নিয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা সমুদ্রের ধার থেকে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে পুড়িয়েছে। ম্যাগুেলাকে খেতে দিয়েছে। বড় বড় চিংড়িমাছ সমুদ্রের ধারে ধারে জলজ ঘাসের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায়। নীল স্ফটিক জল, খিদে পেলে চিংড়ি মাছ তুলে এনেছে। পুড়িয়ে নিজে খেয়েছে। তাকে খেতে দিয়েছে। তারপর ম্যাগুেলা আবিষ্কার করেছিল, বুড়ো মানুষটা বিশাল একটা গাছের কাণ্ডে তার নাম লিখে রেখেছে, নদীর নাম, মেয়ের নাম। দ্বীপে এলে কেউ যেন তার অবর্তমানে টের পায় হানস ওটো নামে এক যুদ্ধপলাতক আসামী দ্বীপটায় জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে—তার কোনো

কষ্ট হয়নি। ঈশ্বর মানুষের জন্য সর্বত্রই বেঁচে থাকার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হানস ওটোর কথাও সে তার মাকে বলেনি, মামাকে বলেনি। বললেই তাদের হাজার প্রশ্ন। এত প্রশ্নের জবাব দিতে তার ভাল লাগে না।

কোথায় সে দ্বীপ?

কোথায় কতদূরে সে বলতেই পারে না। কারণ পালকের গুণ, নিমেষে উড়ে যাওয়া যায়, মেঘেরা ভেসে যায় তার সঙ্গে। মেঘ কাটিয়ে বাতাসের আগে সে উড়ে যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে মেঘের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। দ্বীপটা কত দূরে, হাজার মাইল না তারও বেশি সে জানে না। সে শুধু জানে লোকটির নাম হানস ওটো। সে শুধু জানে তার মেয়ে আছে। ম্যাগুেলারই বয়সী হবে হয়তো। নয়তো তাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে কেন? মেয়ের নাম, নদীর নাম গাছে লিখে রাখবে কেন! মানুষের তো সবচেয়ে প্রিয় তার নদী আর গ্রাম। গ্রামের নামও লিখে রেখেছিল। হানস ওটো কোন্‌দেশের লোক তাও সে জানে না। যে দেশেরই হোক, মেয়েকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সব বাবারই এক। হানস নিজেও জানে না, কতকাল সে অতিবাহিত করেছে দ্বীপে। থাকতে থাকতে দ্বীপের গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি তার বন্ধু হয়ে গেছে। নিজের গাঁয়ের নাম ভুলে গেছে। নদীর নামও। মানুষ যেখানে থাকে, বড় হয়, সে অরণ্যই হোক, নির্জন দ্বীপই হোক প্রিয় হয়ে যায় তার। হানসের তাই হয়েছিল, বুড়ো হয়ে সে ভুলেই গেছিল, তার দেশ আছে, বাড়ি আছে, নদী আছে, মেয়ে আছে।

এসব মনে হলেই বাবার জন্য তার কষ্ট বাড়ে। বাবাও একদিন ভুলে যাবে তার কথা, টিলার উপর তাদের লাল নীল রঙের কাঠের বাড়ির কথা। আপেল বাগানের কথা। গীর্জার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে যে তার বাবার হাত ধরে পাইন ফেস্টিভ্যালে যেত—তাও ভুলে যেতে পারে। দ্বীপ কিংবা অরণ্যের গাছপালা, মানুষের কত প্রিয় হতে পারে হানস ওটোকে না দেখলে সে টের পেত না।

এই একটা আতঙ্ক থেকেই সে এত অস্থির। বাবা তার হয়তো একদিন বাড়ি ফেরার কথাই ভুলে যাবে।

বাবা যদি তার কথা ভুলে যায়, মা-র কথা ভুলে যায় তবে আর ম্যাগুেলার বেঁচে থেকে কি হবে। ওয়াকার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে বাড়ি না থাকলে, বেচারা ওয়াকাকে মামা কেবল ধমকাবে।—'গেল, কোথায় মেয়েটা? খুঁজে দ্যাখ!' তারপর বলবে, 'এত করে বলি, ম্যাগুেলাকে ফেলে কোথাও যাস না, তাও তুই পাইনের জঙ্গলে ঢুকে গেলি! ওখানে কি আছে তোর! ওখানে গেলে সেই জাদুকরের দেখা পাওয়া যাবে! তুইও কি চাস, জাদুকর তোকে কিছু দেবে! ওটা তো পাথরের মূর্তি। সমুদ্রের কিনারে পড়েছিল। শহরের মেয়র খবর পেয়ে ছুটে গেছে। শিশুরাও। একেবারে রাজবেশ। সাদা পাথরের মূর্তি। মাথায় মিনা করা বাদশাহী টুপি, ময়ূরের পালক মাথায়, পরনে আলখাল্লা। পায়ে নাগরাই জুতো। পাথরের রাজপুত্র বলা যায়। তুই কি ভাবিস ওয়াকা, ম্যাগুেলাকে জাদুকর অদৃশ্য করে রাখে! তুই কি জাদুকরের পায়ের কাছে বসে বারবার প্রার্থনা করিস, —ম্যাগুেলার সুমতি দাও। ম্যাগুেলা ফিরে এসেছে, ওকে আর তুমি অদৃশ্য করে রেখ না। বুচার মামা, লুসি মাসির ত্রাস বোঝো না। এমন একটা ছোট্ট মেয়ে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে কত কষ্ট বল! সে কোথায় যায়, তুমি ঠিক জান। বলে দাও না, ম্যাগুেলা কোথায় যায়। তুই মূর্তিটিকে তাই বলিস?'

ওয়াকার তখন এক কথা, 'না কর্তা কিছু বলি না তাকে?'

বুচার মামা বলবে, 'ফের যদি দেখি ওয়াকা, তুই জাদুকরের বাগানে ঢুকেছিস, পা খোঁড়া করে দেব।'

জাদুকর পাথরের। কোথা থেকে কিভাবে যে সমুদ্রের ঢেউ ফেলে দিয়ে গেছে তাকে, কেউ তা জানে না। তা এটা বেশ একটা রহস্য।

শহরের বেলাভূমিতে জাদুকর পড়ে আছে। সেই জাদুকর—যে জাহাজে এসেছিল, যে পাতার বাঁশি বাজাত—যে শিশুদের নিয়ে পাইন ফেস্টিভ্যালের দিনে, মিছিল বের করেছিল—ঠিক সেই পোশাকে, সেদিন সে যা পরে পাইন ফেস্টিভ্যালে শহরের রাস্তায় নেমে এসেছিল, শহরের মানুষজন তাকে দেখে তো অবাক—বাড়ির কাচ্চা-বাচ্চারা সব ছুটে বের হয়ে গেল, পাতার বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে সব শিশুদের সে বের করে নিল, সে যদি মাস কাবার না হতেই পাথরের মূর্তি হয়ে ভেসে আসে আর বেলাভূমিতে পড়ে থাকে—তবে মানুষের দোষ কি! তারা তো অবাক হবেই।

ম্যাগুেলা উড়ে যাচ্ছে, আর বাড়ির কথা ভাবছে। মা-র কথা, ওয়াকার কথা, মামা বুচার ঠিক বাগানে পায়চারি করছে। শহরের লোকজন বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, ভুতুড়ে মেয়েটা সত্যি এবারে উধাও! এতদিন তো সে বাড়ির বাইরে কখনও থাকে না। শহরের ছেলে-মেয়েদের চোখেও ঘুম নেই সম্ভবত। ওয়াকা অস্থির হয়ে পড়বে। সে পাইনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে। উপত্যকায় আপেলের বাগানে ঘুরে বেড়াবে কিংবা ভেড়ার পাল নিয়ে যারা নিচে নেমে যায়, তাদের কাছে খোঁজাখুঁজি করবে, 'ম্যাগুেলাকে দেখেছ! কোথায় যে আছে! কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। খায় কি!' অবশ্য খাবার ভাবনা থাকার কথা না। চেরি ফলের বাগানে ঢুকে গেলে চেরি ফল খেয়ে আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে—কিংবা আঙুরের ক্ষেতে যদি লুকিয়ে থাকে, তবে তো হাইতিতিরও খুব মজা। আঙুর খেতে ওস্তাদ। আর কোনো খামারে পালিয়ে থাকলে, সেখানে দুধ মাখন সব পাবে। নদী এবং হ্রদের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ালেও তার ভয় থাকার কথা না। ম্যাগুেলার ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই তাকে আদর করে খাওয়াতে পারে। মেয়েটার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে, এমনও এখন শহরের লোকজনরা বিশ্বাস করে। তার পক্ষে পাঁচ-সাতদিন নিখোঁজ হয়ে থাকা খুব কঠিন না। এমনকি এখন রাত জেগে ছাদে বসে থাকবে সবাই—ওর ফেরার সময় শহরের মাথায় ঘণ্টাধ্বনি হয়। সাধারণ মানুষ তো জানে না হাইতিতির গলায় ম্যাগুেলা রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দেয়। সে এই রুপোর ঘণ্টা পেল কোথায় তাও কেউ জানে না। তা হাইতিতি ভাসতে ভাসতে নেমে এলে ঘণ্টা বাজবে, ঘণ্টাধ্বনি হবে—এবং নীল আকাশে দেখা যাবে ছেঁড়া রুমালের মতো কি যেন দুটো ভেসে চলে আসছে। তখনই তারা বলবে, লুসির ভুতুড়ে মেয়েটা ফিরল। যাক্ কিছু যে হয়নি—কোথায় যায়! লুসির প্রাণে এবার জল এল! সবাই লুসিকে এজন্য কিছুটা মা মেরীর কাছাকাছি জননী ভেবে থাকে। তাকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধাও করে। বাগানের সুমিষ্ট ফল, ভেড়ার বাচ্চা উপহারও পাঠায় কেউ কেউ।

ম্যাগুেলা দ্রুত বাতাস কেটে নেমে আসছে। এতদিন এভাবে তার বাইরে ঘোরা উচিত কাজ হয়নি। তারপরই মনে হলো, সে না থাকলে ফনের আদেশে মুম্বাটুকে পুড়িয়ে মারা হতো। একজন মানুষের প্রাণ বড়, না মা-র দুশ্চিন্তা বড় কিছুতেই ম্যাগুেলা তার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। মাকে সে কষ্ট দিতে চায় না। সেবারে, সেই প্রথম, পালকের টুপি আর রুপোর ঘণ্টা পেয়ে কি বোকামিই না করে ফেলেছিল! পাইনের জঙ্গলে এভাবে কেউ পালকের টুপি ফেলে রেখে যায় না। রুপোর ঘণ্টাও ফেলে রেখে যায় না। যদি যায়, তবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এবং সেদিনই স্বপ্নে কে যেন তাকে বলে গেল, আরে সেই জাদুকরই তো, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ওটা অমূল্য জিনিস—তোমার বাবা নিখোঁজ। তাকে তুমি ওটা পরে খুঁজতে

যেতে পারবে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, তুমি ইচ্ছে মতো উড়ে যেতে পারবে। তারপর মনে হলো, না, যেন এটা জাদুকর তার হাতে দিয়েই বলেছিল—কি যে হয়, কখনও মনে হয় স্বপ্নে, কখনও মনে হয় বাস্তবেই মানুষটি তার নিখোঁজ বাবার কষ্ট বুঝে পালকের টুপিটি তাকে দিয়ে গেছিল। তবে রহস্যময় মনে হলেও তার কেন যে মনে হয়, জাদুকর বসন্তনিবাস তার ভালই চায়। এই যে সে ফনের রাজত্বে ঘুরে এল, তাও বোধহয় জাদুকরের ইচ্ছে। তা না হলে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সে নিমেষে উড়ে যায় কি করে! তবে এটা মনে আছে, জাদুকর তাকে পইপই করে বলেছে, 'এই টুপির খবর, রুপোর ঘণ্টার খবর কেউ যেন না জানে—এতে মন্ত্রগুণ নষ্ট হয়ে যায়।' সে এজন্য কিছুই বলতে পারে না। ওড়াউড়ির শুরুতে লায়ন রকে গেছিল। সবে সে পালক আর রুপোর ঘণ্টা পেয়েছে। পেয়েই টুপিটা মাথায় দিতেই কেমন হালকা হয়ে গেল। উড়তে থাকল—তার খুব ভয় ধরে গেছিল—আরে বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে তাকে! সমুদ্রের উপরে যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে! যেই না ভয় সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পায়, বাড়ির দিকে উড়ে যাচ্ছে—কি সুন্দর বাড়িটা—এত উপর থেকে তো সে তার বাড়ি কখনও দেখেনি। সবুজ পাইনের জঙ্গলে পাহাড়ের মাথায় বাড়িটা মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য সুন্দর। সামনে সমুদ্র, সমুদ্রের বালিয়াড়িতে পাথরের জাদুকর একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেও ছিল। বলেছিল, 'ভয় কি! মাথায় পালকের টুপি আছে, ভয় কি! তুমি যা ভাববে, ঠিক সেমতো টুপিটা কাজ করবে। তোমার ভয় ধরে গেল, তাই আবার বাড়ির দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে।' তারপর বলেছিল, 'তুমি একা কেন—হাইতিতি কোথায়। ওকে সঙ্গে নাও। তারও তো আছে রুপোর ঘণ্টা। একা ওড়াউড়ি করলে ভয় পাবারই কথা। আমারও ভয় করত। এই যে সমুদ্রবেলায় তোমরা আমাকে পাথরের মূর্তিতে বন্দী করে রেখেছ, আমারও একা ভয় করে। ভয় করে বলেই তো সব পাখিরা ওড়াউড়ি করে মাথার উপর। রাতে যখন শহর ঘুমিয়ে পড়ে তখনও একটা বড় অ্যালবাট্রস পাখি আমার মাথায় চুপচাপ বসে থাকে। আমাকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে তোমার ভয় করবে না। মানুষের সঙ্গে পাখি, প্রজাপতি, শুধু পাখি, প্রজাপতি কেন, সব প্রাণীরই একটা মধুর সম্পর্ক থাকে। যারা শুধু মানুষের কথা ভাবে, তারা স্বার্থপর। মানুষের সঙ্গে গাছপালারও গভীর সম্পর্ক। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। বড় হতে পারে না।'

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে স্বাতি নক্ষত্রের গায়ে যেন কুয়াশার জল লেগে গেছে। আকাশ আর নক্ষত্রমালার ভিতর ম্যাণ্ডেলা ভেসে যাচ্ছিল। ম্যাণ্ডেলা কত কিছু ভাবছিল। বাড়ি ফেরার সময়ই তার সব কথা মনে হয়। এমনকি বাবার লাগানো প্রিয় গাছগুলোর কথাও মনে হয়। কাঠের সেই লাল নীল বাড়িটার চারপাশে, বাবা কত দেশ থেকে সব সুন্দর সুন্দর গাছ এনে লাগিয়েছে। বাবার জন্য আগে মন খারাপ হলে সে গাছগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। সিলভার-রক গাছটিও তার প্রিয়। শুধু তার কেন, হাইতিতিরও। হাইতিতিকে তো গাছটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুযোগ পেলেই সে জঙ্গলে ঢুকে যেতে চায়। এমনও হয় যে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায়। ওয়াকা, সে, বুচার মামা পর্যন্ত টর্চ হাতে পাইনের জঙ্গলে খুঁজতে বের হয়। বাড়িটার নিচে বিশাল পাইনের বন—কতদূর চলে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে তারা বুঝবে কি করে। না, খুঁজে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না নিরাশ তারা। আর বাড়ি ফিরে দেখে, দুষ্টুটা সিলভার-ওক গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে! গাছটাকে হাইতিতিও কত ভালবাসে এটা যেন তার প্রমাণ।

সেই গাছটা সে কতদিন দেখে না। গাছটার নিচে বসে থাকে সকাল হলে। গাছের ছায়ায় নীল রঙের বেতের চেয়ারে সে বসে থাকে। হাইতিতি তখন একেবারে পোষা কুকুরের মতো। সে যা খাবে, ভাগ না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে কখনও গিয়ে সে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। টমেটো সস দিয়ে স্যান্ডউইচ খেলে হাইতিতিরও চাই স্যান্ডউইচ, টমেটো সস। এত পাজি কখনও লাফিয়ে হাঁটুতে দু-পা রেখে ঝুঁকে দেখবে সে কি খাচ্ছে।

সেই গাছটাও তাকে টানছে, এই টানের জন্যই সে মেঘ ফুঁড়ে বের হয়ে আসছে। মেঘেরা কি, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, তাদের মা-বাবাও নেই, ঘরবাড়ি তাদের কোথায় সে জানে না, মেঘেরা ঝরঝর করে ঝরে পড়লেই খালাস। তাদের মতো ঢিমেতালে ভেসে বেড়ালে চলবে কেন। সে সাঁ সাঁ করে উড়ে চলেছে, দুরন্ত ঈগল কিংবা কোনো অ্যালবাট্রস পাখির ঝাঁক নিমেষে পড়ে যাচ্ছে তার পেছনে। রকেটের মতো সে ছুটে চলেছে। মা রোজ আশা করছে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে তাকে! দুপুরেও খাবার নিয়ে বসে থাকছে হয়তো। রাতেও। আর রোজ ঠিক গীর্জায় যাচ্ছে প্রার্থনা করতে। রাত হলে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন আর আগের মতো মা ত্রাসে পড়ে যায় না। আগে তাকে না দেখলেই কান্নাকাটি জুড়ে দিত। বুচার মামাকে ফোন করত, 'ম্যাণ্ডেলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' ব্যস্। সারা শহর তোলপাড়—থানা-পুলিশ কত কিছু হয়েছে। কিন্তু যে উড়তে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে, থানা-পুলিশের সাধ্য কি তাকে খুঁজে বের করে।

সেই সেবারে—দূর ছাই মনেও থাকে না। সেই সেবারে বললেই তো হয় না, আরে ঐ যে লায়ন রকে তারা যেবারে যায়—পুরো চব্বিশ ঘণ্টা নিখোঁজ। তা এতটুকুন ছোট্ট মেয়ের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা নিখোঁজ হয়ে থাকা যে কত ঝকমারি—বাড়ি ফিরে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিল।

হাওয়ায় ভেসে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনে হয়েছিল, তাদের বাড়িতে মানুষজনের ভিড়, পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী হলো রে বাবা!

তাদের বাড়ির সামনে সুন্দর ঘাসের লন। সবুজ—আর সেখানে এত মানুষের ভিড়! নিচে পাইনের বনভূমি, সেখানেও লোকজন কি খোঁজাখুঁজি করছে। বাড়ির পেছনে সাদা পাহাড়—এপমন্ট হিল। প্রায় সারাটা বছর তুষার শৃঙ্গ রোদে ঝকমক করে। বৃষ্টির দিনে, কিংবা কুয়াশা হলে পাহাড়টা কখনও কখনও আড়ালে পড়ে যায়। তখন কেন যে বাড়িটা তাদের ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হয় সে বুঝতে পারে না। কুয়াশা থাকায় সে পাহাড়টা দেখতে পায়নি—তবে পাহাড় না থাকলেও, সবই আগের মতো আছে। বনভূমির নিচে ছোট্ট বেলাভূমি। আর আছে অজস্র লাল নীল পাথর, ফুলের উপত্যকায় রাজবেশে জাদুকর দাঁড়িয়ে আছেন। এমনকি পাহাড়ের নিচে সবুজ ঘাসের চারণভূমিতে সে অজস্র ভেড়ার পালও দেখতে পেয়েছিল। সবই এত ঠিকঠাক, তবু কেন যে বাড়িতে তাদের এত লোকজন প্রথমে ঠাউর করতে পারেনি।

পরে বুঝেছিল, অ তাইতো, সে যে মনের আনন্দে হাইতিতিকে নিয়ে লায়ন রকে উড়ে গেছে তা তো কেউ জানে না' সে পাইনের বন থেকে উঠে আসার সময়ই সবাই হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল—ঐ তো ম্যাণ্ডেলা! ঐ তো হাইতিতি! মা প্রায় পাগলের মতো ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর হাউহাউ করে কাঁদছিল।

বুচার মামার গম্ভীর গলা, 'কোথায় গেছিলে—দিনকাল ভাল না, বিচ্ছু মেয়ে,

কোথায় গেছিলে—দিনকাল ভাল না

তোমাকে নিয়ে তো আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব দেখছি। বল, কোথায় গেছিলে!'

সে তো বলতে পারে না, লায়ন রকে গেছিল। জাদুকর যদি রাগ করে। জাদুকর তো স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতেই পারে—'ম্যাগুলো তোমার একদম বুদ্ধি নেই। ওরা বিশ্বাস করবে—তুমি গেলে কি করে জানতে চাইবে না! এখন লায়ন রকে যাওয়া যায় না। ঝড়ের দরিয়া বলে ফেরি বন্ধ! স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তুমি গেলে কি করে? কি দরকার বলার, লায়ন রকে গেছিলে—চুপ করে থাকলেই তো হয়।

॥ দুই ॥

সে সেবারে অবশ্য মামার দাবড়ানিতে ভয়ে বলে ফেলেছিল সব। লায়ন রকে উড়ে গেছে। এমনকি টিউলিপ ফুল খেয়ে হাইতিতির কি আনন্দ। সে লাফায় আর টিউলিপ ফুল খায়। যত পায় তত খায়। কিন্তু মামা বিশ্বাসই করলেন না। ভাবলেন মিছে কথা বলছে।

গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন, 'এই তোমার শিক্ষা! তুমি জান না, গুরুজনদের সঙ্গে মিছে কথা বলতে নেই। আমরা খোঁজাখুঁজি করে হয়রান। বাড়িটার উপর এত ভুতুড়ে উপদ্রব। তোমার বাবা জাহাজে গেলেন, আর ফিরলেন না, তুমি বড় হতে না হতেই নিখোঁজ হয়ে গেলে। কোথায় না খুঁজেছি—পিকাকোরা পার্কে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। তোমার তো ধারণা, তোমার বাবা সেখানে লুকিয়ে আছেন। বল, সত্যি করে বল, কোথায় সারাটা দিন ঘাপটি মেরে ছিলে। না বললে, ' বলেই লুসিকে ডেকে বললেন, 'তোমার অনেক ভোগান্তি আছে। এ মেয়ে তোমাকে ভোগাবে। যাও নিয়ে যাও। তালা বন্ধ করে ফেলে রাখ ঘরে। কোথায় যায় দেখব! বাবাকে খুঁজতে যায়। আর কিছু খোঁজার অজুহাত পেল না!'

সহৃদয় পুলিশ অফিসারটিই তাকে সেবারে বলতে গেলে রক্ষা করেছিল। বলেছিল, 'ওকে আর বকাবকি করবেন না। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ওকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। নিজে না বললে, ভয় দেখিয়ে কথা বের করতে যাবেন না। শিশুরা একটু চঞ্চল হয়েই থাকে।' পুলিশ অফিসারটি আরও জানিয়েছিল, মিঃ হাসিমারা আসবেন। তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ। সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটিই হয়তো বলেছেন, নিরুদ্দেশ থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরে এলে তাকে অযথা প্রশ্ন করে উত্যক্ত করতে নেই।

বুচার মামা এসব কারণেই বোধহয় নানা বিভ্রমে পড়ে গেছিলেন। তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'মা আমার খুব ভাল। বেশ বেড়িয়ে হাওয়া খেয়ে ফিরলে। তা কোথায় গেছিলে? নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা। আমরাও না হয় যেতাম।' আর তখনই সে বোকামি করে ফেলল, 'জান বুচার মামা—আমরা না, লায়ন রকে গেছিলাম।'

বুচার হতভম্ব।

'লায়ন রকে! কেন? কি করতে!'

'বাবাকে খুঁজতে।'

বুচার মামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিশ্বাস করবে কেন, সে তার বাবাকে খুঁজতে লায়ন রকে গিয়েছিল। আসলে শিশুরা মনে মনে নানা জায়গায় ভ্রমণ করে থাকে। এও বোধহয় তাই—এমনই হয়তো ভেবেছিলেন বুচার মামা। শুধু বলেছিলেন, 'বাবাকে একা খুঁজতে গেলে? ভয় করল না।'

'একা কেন? সঙ্গে হাইতিতি ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ না?'

বোকা হাইতিতিও কম যায় না! সে সোজা ঢেকুর তুলে দুটো তাজা টিউলিপ ফুল জিভে তুলে এনেছিল। তারপর জিভ বের করে দেখিয়েছিল, মনের আনন্দে সে সারাদিন টিউলিপ ফুল খেয়ে বেড়িয়েছে। একমাত্র এসময়ে লায়ন রকেই টিউলিপ ফুল ফুঁটে থাকার কথা, অন্যত্র তারা যে ঝরে গেছে বুচার মামা কেন—সবাই সেটা জানে!

বুচার মামা এরপর আর কি প্রশ্ন করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হতভম্ব অবস্থা বোধহয় কিছুটা কেটে গেছে। লোকজনের ভিড়ও পাতলা হয়ে আসছে। সবাই বলাবলি করছিল, 'মেয়েটার মাথায় নিশ্চয় ভূত চেপেছে।' অথবা বাবাকে খুঁজতে যায় বলায় মনে করেছে, শেষে তার বাবাই মেয়েটাকে খাবে। কোথায় কোন গভীর সমুদ্রে জাহাজডুবিতে মারা গেছে কে জানে—তার প্রেতাত্মা যে মেয়েটাকে ঘরছাড়া করতে চাইছে না, তারই বা ঠিক কি! বরং এসব ব্যাপারে পুলিশ, শিশুবিশেষজ্ঞ না ডেকে ওঝা গুনিন ডাকাই বেশি শ্রেয়। ঝাড়ফুঁক করলে নিরাময় হয়ে যেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা দেখছিল মাকে ঘিরে প্রতিবেশীরা নানা উপদেশ দিচ্ছে। ওয়াকা মা-র ফুটফরমাস খাটছে। ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসায় তার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সেও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে টুকিটাকি কাজ সারার সময়।

আসলে বুচার ভেবেছিলেন, পাইনের বনে ঢুকে মেয়েটা নির্ঘাত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরই মনে হলো, রাস্তা হারালে, ফের পথ চিনে বাড়ি এল কি করে! এও হতে পারে বাবার খোঁজে সে পাইনের বন পার হয়ে কোনো উপত্যকায় উঠে গেছিল। কিংবা কোনো আপেল বাগানে, বাবা নিখোঁজ—কোথায় আর যাবে, ঠিক খুঁজে বের করবে এমন আশাতেই সে আর বাড়ি ফেরার কথা মনে রাখতে পারেনি। এও হতে পারে বাবার কথা ভাবতে ভাবতে কোনো পাথরে বসে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর সকাল হলে বাড়ির কথা মনে হয়েছে। মার কথা মনে হয়েছে। আর স্থির থাকতে পারেনি। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখতে পারে। স্বপ্নে সে লায়ন রকে ঘুরে আসতেই পারে। সুতরাং ম্যাণ্ডেলার বিশ্বাসকে বুচার ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। টিউলিপ ফুল সব ঝরে গেছে তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'তা হলে লায়ন রক থেকে ঘুরে এলে?'

'হ্যাঁ মামা।'

'বেশ করেছ। একা অবশ্য যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি।'

'তুমি না মামা, খুব বোকা! হাইতিতি আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়, কোথাও থাকে!'

বুচার অবশ্য তা জানেন। তার ভগ্নীপতির এই এক শখ ছিল—পৃথিবীর যেখানে যা কিছু পাওয়া যায় মেয়ের জন্য নিয়ে আসতে পারলে, যেন তার সমুদ্র-সফর সফল। আর ম্যাণ্ডেলারও আবদারের শেষ ছিল না।

'বাবা আমার চাই সিংহলের হাতি।'

বাবা তার জন্য সিংহল থেকে কাঠের হাতি কিনে এনেছিলেন।

'বাবা আমার চাই জাভাদ্বীপের গিরগিটি।'

বাবা ম্যাণ্ডেলার জন্য পাথরের গিরগিটি নিয়ে এলেন।

'বাবা আমার চাই, তুষার হরিণ!'

বাবা নিয়ে এলেন, রুপোর একটা সাদা হরিণ।

'বাবা আমার চাই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা!'

ব্যস যেমন বাবা তেমনি তার মেয়ে। তিনি সেবারে নিয়ে এলেন সত্যি একটা জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। ম্যাণ্ডেলা যা চায় তাই পায়। বাবার জাহাজ কবে ফিরবে সেই আশায় কতদিন জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার জাহাজ ফেরার কথা আছে জানলেই ম্যাণ্ডেলা বাড়ির লনে বসে সাদা জাহাজের অপেক্ষায় থাকে। বাড়িতে বসে থাকলে নীল সমুদ্র দেখারও একটা আনন্দ আছে। টিলার উপরে বাড়ি—সমুদ্র অনন্ত অসীমে মিশে গেছে—ঝড় এবং তরঙ্গমালা উভয়ই সে কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায়। নিচে পাইনের বনভূমি, গাছগুলি ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়ে। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে—কখনও সমুদ্রের জলকণা ভেসে এসে নানা কারুকার্য গড়ে দেয় জানালার কাঁচে। এমন মেয়ের জন্য বাবার কেন শখ হবে না—একটা জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারার জন্য বুচার জানেন, পারলে ভগ্নীপতি সারা পৃথিবীর সব বিচিত্র গাছপালা পাখি জীবজন্তু বাড়িটায় ছড়িয়ে দেয়—নানা মজা সৃষ্টি করার খুবই আগ্রহ তার।

সেই ভগ্নীপতি যেবারে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটি নিয়ে জাহাজ থেকে নামল, কি ভিড় বাচ্চাটাকে দেখার জন্য। বাড়িতেও ভিড়। ম্যাণ্ডেলাকে খুশি করার জন্য সেবারে আর কাঠ নয়, পাথরের নয় একেবারে রক্তমাংসের জীব এনে হাজির করলেন। তবে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা তো—পোষ মানবে কেন! খায় না, শুয়ে থাকে। ম্যাণ্ডেলা বোঝে ক্যাঙ্গারুরও মা-বাবা থাকে। মা-বাবার জন্য মন তো খারাপ করবেই।

'এই দুধ খাও।'

'খাবো না!'

'না খেলে, আমিও খাচ্ছি না।' ম্যাণ্ডেলা গুম মেরে বসে থাকত বাচ্চাটার সামনে। লুসি রাগারাগি করছে—'তুমি কি, মেয়ে বলল, আর জ্যান্ত একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা ধরে আনলে! বাঁচবে।'

ম্যাণ্ডেলার মনে আছে, বাবা শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, 'বাড়িতে ম্যাণ্ডেলা আছে। বাঁচবে। ভালবাসা পেলে কে না বাঁচে! বাঁচতে চায়!'

তখন তো বাচ্চাটা ভাল করে লাফাতেও পারত না। ম্যাণ্ডেলার আদরে মাথাটিও গেছে। ম্যাণ্ডেলা খেতে বসলে নিজেই লাফিয়ে এসে বসে পড়বে। টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার। ডাইনিং টেবিলে কারুকাজ করা চিনামাটির প্লেট, বাটি, চা-এর পট, নুনদানি, জলের মগ। চারপাশে চারজন। বাবা মা একদিকে—সে আর হাইতিতি একদিকে। ওয়াকাই নামটা দিয়েছিল। বাড়িতে কেউ অতিথি এলে তার যে একটা নাম থাকে ওয়াকাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।

কত নাম ঠিক করা হলো।

ম্যাণ্ডেলার একটাও পছন্দ না।

'সি-গাল।'

'সি-গাল কেন? ও কি পাখি! সি-গাল নাম রাখছ! ও কি উড়তে পারে? ওর কি ডানা আছে?'

বাবা বললেন, 'শ্যাময় নামটা বেশ।'

ম্যাণ্ডেলা জানে না শ্যাময় কোনো নাম হতে পারে। সেটা আবার কি বস্তু?

বাবা বলেছিলেন, 'শ্যাময় একপ্রকারের হরিণ। আলপস পর্বতমালায় তারা বিচরণ করে। তুষার হরিণও বলতে পার। রঙটা তো হরিণের মতো। শ্যাময় নামটাই আমার পছন্দ।'

মা ধমকে উঠেছিল, 'যেমন মেয়ে তেমনি বাবা। নাম নিয়ে এত দুশ্চিন্তা! কেউ খাচ্ছে না। কেউ কাঁটা চামচ ধরছে না। আর বাচ্চাটাও হয়েছে, দেখ, যেন সব বুঝতে পারে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কে কি নাম রাখতে চায়, নামটা পছন্দ কিনা, বোঝার চেষ্টা করছে।'

মা-র ধমকে সবারই মনে হলো, খাবার টেবিলে গল্পও করতে হয়, আবার খেতেও হয়। তারা শুধু গল্পই করছে। ওয়াকা ডাইনিং টেবিল সাজিয়ে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি নাম রাখতে চায়, কারো সে বিষয়ে যেন কোনো আগ্রহ নেই জানার।

তার খুব অভিমান। সে কোনো কথা বলছে না। গুম মেরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই যে বাজার থেকে, বন থেকে বাচ্চাটার জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনে কেউ যদি তার কষ্টটা বুঝত। সে-ই তো আবিষ্কার করেছিল, বাচ্চাটা খেতে ভালবাসে আনারস আর তরমুজ। লেটুস পাতাও তার প্রিয় খাবার। আর বুনো ফল এবং গাছের নরম শেকড়-বাকড়। যেমন বনআলু তার খুব প্রিয়। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওয়াকা লতা দেখলেই চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর, কোনটা শালুই লতা। লতার ফল দেখলেও সে চিনতে পারে। দুটো লতাই একরকম দেখতে। পাতাও একরকমের। পানপাতার মতো। ওয়ালনাট গাছ কিংবা কৌরিপাইনের কাণ্ড খুব প্রিয় এ-দুটো লতারই। গাছের ডালপালা জড়িয়ে এমন বিতিকিচ্ছি অবস্থা করে ফেলে যে তখন গাছটাকে আর চেনাই যায় না। ঝুপড়ি মতো হয়ে যায় গাছটা। এত সব কারণে দু-একবার ওয়াকা যে না ঠকেছে তা নয়। বনআলু ভেবে লতার গুঁড়ি কুপিয়ে দেখা গেল, কিছুই নেই। শালুই লতার মূল বলে বিশেষ কিছু থাকে না। লতার নিচে হাতির দাঁতের মতো

নরম রসালো মূলও থাকে না। পরিশ্রমই বৃথা। এখন অবশ্য সে জঙ্গলে ঘুরে ফুল এবং ফল দেখে চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর। কোনটা শালুই লতা। শালুই লতার ফুল এবং ফল দুই হয়। ফুলগুলি কাকটাস লতার ফুলের মতো। নীল রঙের। ফল হলে লম্বা পটলের মতো দেখতে। বিস্বাদ খেতে। মুখে দিলে বমি হবেই। আর বনআলুর কোনো ফুল হয় না। ফল হয়। ফলগুলি দেখতে বিশ্রী। বড় জড়ুলের মতো যেন থোকা থোকা ঝুলে থাকে। পুড়িয়ে খেতে দারুণ! বাচ্চাটা কি খায়, না খায় তাও জানা নেই। তবে দুধ খায়। দুধ সব বাচ্চারাই খায়। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা দুধ খাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুধ তো বার বার খেতে ভাল লাগে না। মুখরোচক কিছু চাই। আর এজন্যই হাইতিতির ডিসে লেটুস পাতা, বনআলুর টুকরো—কিছুটা শাঁখআলুর মতো কেটে রাখা হয়েছে। আনারসও কেটে রাখা হয়েছে। সব রেডি—অথচ খাওয়ার নাম নেই। বাচ্চাটার নাম নিয়ে সবাই পড়েছে। অথচ ওয়াকার মতামত এ ব্যাপারে সবাই অগ্রাহ্য করছে। ওয়াকার তো রাগ হবেই।

ম্যাণ্ডেলা মা-র কথাতে সচকিত হয়ে গেছে। সত্যি তো কেউ কিছু মুখে তুলছে না। গ্রিন পিজ আর টমেটোর স্যুপ—ভাপ উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়ালও নেই। মা-র তো রাগ হবেই। সাদা ন্যাপকিন ভাঁজ করা। কেউ খুলে হাঁটুতে বিছিয়েও নিচ্ছে না। যেন নামকরণ না হলে কেউ কিছু মুখে দেবে না ঠিক করেছে। অগত্যা কাঁটা চামচে গেঁথে নিল একটা লেটুস পাতা। ম্যাণ্ডেলা বাচ্চাটার মুখের কাছে নিয়ে গেলে, মুখ হাঁ করল। বাচ্চাটার বায়নাও শেষ ছিল না তখন! ম্যাণ্ডেলা না খাইয়ে দিলে কিচ্ছু মুখে দেবে না। একবার সে বাচ্চাটার মুখে খাবার তুলে দেয়, একবার সে চামচে স্যুপ খায়। আহার পর্ব শুরু হতেই বাবা যে কেন বললেন, 'ওয়াকা কি বলে?'

আর যায় কোথায়।

ওয়াকার মুখে একগাল হাসি।

সে বোধহয় রাগে ক্ষোভে ঘামছিল। তার তখন সব ঠাণ্ডা। সে জামার আস্তিনে মুখ মুছে বলল, 'হাইতিতি।'

'হাইতিতি আবার নাম হয় নাকি!' মা মুরগির রোস্ট কেটে সবার পাতে দেবার সময় কথাটা বলেছিল।

ব্যস, ওয়াকার আবার মন খারাপ। টিকল না। তার নাম পছন্দ না। সে ব্যাজার মুখে চায়ের পটে গরম জল ঢেলে দিল। খাওয়া হলে ওয়াকা সব যখন সাফ করে তুলে নিয়ে যাবে তখন সবাই এক পেয়ালা চা না হয় কফি খায়। সে হাতের কাছে সব যোগাড় রাখে। যে যার মতো পট থেকে চা নেয়। চিনি নেয়। দুধও নেয়। তবে বাবা চা-এর লিকারই বেশি পছন্দ করেন—তিনি তাঁর চা-এ কখনও দুধ মেশান না।

ম্যাণ্ডেলার খারাপ লাগছিল। ওয়াকার ব্যাজার মুখ সে একদম পছন্দ করতে পারে না। তাছাড়া ওয়াকারই তো ভাব ছিল বেশি জাদুকরের সঙ্গে। সেই তো জাদুকরকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সেই তো বাড়ি ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল—'জান, জাদুকর বসন্তনিবাস এসেছে শহরে। সে যা চায় পেয়ে যায়। আলখাল্লার ভিতর থেকে যখন তখন সে একটা বেড়ালের বাচ্চা বের করে আনে। তারপর জাদুকরের কান যত ফরফর করে নড়াচড়া করে তত বেড়ালছানাটা বড় হয়ে যায়। শেষে বাঘ হয়ে যায়। বাচ্চারা বাঘ দেখে খুশি হলে, জাদুকরের আর কান ফরফর করে না। বাঘটা ছোট হতে হতে শেষে আবার বেড়ালছানা হয়ে যায়। তারপর লাফিয়ে জাদুকরের আলখাল্লার পকেটে ঢুকে পড়ে।' তবে ওয়াকা এ-সব ম্যাণ্ডেলাকেই বলে। কারণ বড়রা তো বিশ্বাস করবে না। বাচ্চারা যা দেখতে পায় বড়রা তা দেখতে পাবে কেন।

তার মনে আছে, বাবা সেদিনই সমুদ্রযাত্রায় বের হয়ে গেছিলেন। খুব ইচ্ছে ছিল, জাদুকরের খবরটা বাবাকে দেয়। কিন্তু বাবা যদি বিশ্বাস না করে—ওয়াকা তো বলেছে, 'ছোটরা যা দেখতে পায়, বড়রা তা দেখতে পায় না। বড়রা বিশ্বাস নাও করতে পারে। বিশ্বাস না করলে জাদুকরের অপমান না! সে রেগে গেলে, তাদের ক্ষতিও করতে পারে। বিশ্বাসীদের জন্য জাদুকর—অবিশ্বাসীদের প্রতি জাদুকর খাপ্পা।' পরপরই ওয়াকা বলেছিল, 'আমাদের ধর্মে আছে, তুমি জান মেসাইয়া কি না করেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে কুষ্ঠরুগীর আরোগ্য লাভ করাতে পারেন। মূক-বধির তাঁর কৃপায় কথা বলতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পায়। মৃত ব্যক্তির জীবনলাভ হয়। অবিশ্বাসীরা এ-জন্যই তো বিধর্মী।'

খুবই অকাট্য যুক্তি।

ম্যাণ্ডেলা বাবাকে জাদুকরের খবর দিতে সাহসই পায়নি। আর সে-বারই তো বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। বাবা কি কারো কাছ থেকে শহরে জাদুকরের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলেন! খবর পেয়ে কি তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন—'যত্ত সব আজগুবি কথা!' জাদুকর আজগুবি হলে যীশুর দয়াও আজগুবি। কৈ তার বেলায় তো তিনি অন্ধজনে দেহ আলো গোছের। তিনি কত সব অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড করে গেছেন, গীর্জায় গেলে কিংবা মা যখন অত্যন্ত নিরিবিলি পবিত্র গ্রন্থটি পাঠ করেন, তখন তো তিনি কখনও বলেন না—আজগুবি। বরং যীশুর দয়ার কথা পড়তে পড়তে মা কেঁদে চোখ ভাসায়। তারও যীশুর কথা শুনতে শুনতে কেন যে কান্না পায় বোঝে না। মনে হয়, তিনি একজন 'মাস্টার ম্যাজেসিয়ান। তাঁর দয়ায় মানুষ সঠিক পথের খোঁজ পায়। শয়তান শত লোভে ফেলেও তাঁকে কব্জা করতে পারেনি—মানুষের মঙ্গল ছাড়া মাস্টার ম্যাজেসিয়ান আর কিছু ভাবতেই পারতেন না। যীশু রাস্তায় আসছে জেনে দু'জন অন্ধলোক অপেক্ষা করছে। কাছে আসতেই তো তারা চিৎকার করে বলেছিল, প্রভু আপনি আমাদের স্পর্শ করুন। যীশু তাদের চোখে হাত রাখলেন। তারা আবার পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পেল। কত বড় জাদুকর হলে এটা যে সম্ভব! বসন্তনিবাস তাকে পালকের টুপি দিয়ে গেছে—কাউকে বলা যায় না। অথচ তিনি যে একজন প্রবল জাদুকর কেউ বিশ্বাসই করবে না। যীশুর সেই গল্পটাও তো তার মনে গেঁথে আছে। সকাল বেলায় তিনি জেরুজালেমে ফিরছেন। বড় ক্ষুধার্ত। রাস্তায় একটা মরা যজ্ঞিডুমুরের গাছ দেখতে পেলেন। পাতা নেই, ফল নেই। তিনি শুধু বললেন, আমি ক্ষুধার্ত—তুমি কি আমাকে কিছু ডুমুর ফল দিতে পার না! সঙ্গে সঙ্গে গাছটি পাতা মেলে দিল। হাওয়ায় তার ডালপালা দুলতে থাকল। ডুমুর ফলে ভরে গেল ডালপালা। যীশুর শিষ্যরা তো দেখে অবাক। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, প্রভুকে—কি করে সম্ভব? প্রভু বললেন, যদি তোমাদের অটুট বিশ্বাস থাকে, যদি কোনো সংশয় না থাকে, এর চেয়ে আরও অলৌকিক কাজ তোমরা ইচ্ছে করলে করতে পার। এই যে সামনে মাউন্ট অফ অলিভস রয়েছে, তাকে যদি বল, সমুদ্রে বিচরণ কর—তবে সে তাই করবে। যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস জন্মায়, হেন কাজ নেই মানুষের মঙ্গলের জন্য তুমি তা করতে পার না।

ম্যাণ্ডেলা মা-র কাছে শুনেছে, আরও কত অলৌকিক ঘটনার কথা। বাবা জাহাজে চলে গেলে মা তো সারাদিন চুপচাপ কাজ করত, ঘর সাজাতো, বাবার লাগানো গাছগুলিতে জল দিত, তাকে নিয়ে বসাতো—হাতের লেখা, অংক ড্রইং সব খাতাগুলির মলাট দিত যত্নের সঙ্গে। ইস্কুলের নাম, তার নাম, কোন ক্লাস সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দিতে পারলে খুশি হতো। তারপর অবসর সময়ে যীশুর মহিমা পাঠ করে

জান বাবা লাঠিটা না খুব ভারি।

শোনাতো মা। বিশ্বাস করলে মাউন্ট অলিভসকেও যে নির্দেশ দেওয়া যায়, যাও সমুদ্রে গিয়ে বিচরণ কর—আর তক্ষুণি পাহাড়টা হয়তো চলে যাবে সমুদ্রে। আসলে বিশ্বাস। পালকের টুপি পরে সেটা আরও বেশি বুঝেছে। জাদুকরের প্রতি প্রবল বিশ্বাসই তাকে পালকের টুপিটা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। যতই দুর্গম অঞ্চল হোক, যতই দূরের হোক সব দেশে সে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার কি মজা কেউ বুঝবে না।

সে তো একদিন মাকে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'আচ্ছা মা, পাহাড় কখনও সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে। তার কি হাত পা আছে, যে হেঁটে বেড়াবে, নয় সাঁতার কাটবে। পাহাড় কখনও সমুদ্রে হেঁটে যেতে পারে!'

মা চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'বলছিস কি! অমন কথা মুখে কখনও বলবি না। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর মহিমা অপার। তিনি বললে সব হয়। তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন। পাহাড় কেন, সব এক মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। পাহাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের জল তিনি অঙ্গুলি হেলনে শুষে নিতে পারেন। কখনও আর এমন কথা বলবে না।' বলে মা হাঁটু গেড়ে বসেছিল—বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেছিল—'মেয়েটা অবুঝ প্রভু। তার দোষ ধর না।'

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে সেই প্রিয় এগমন্ট হিল। এই পাহাড়টার কোলেই তার প্রিয় শহর নিউ প্লাইমাউথ। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে শহরটা। ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। বন্দর এলাকা পার হয়ে সি-ম্যান মিশান—ট্রাম গাড়ি এক বগির। গাড়িটা দুলকি চালে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পার হয়ে যখন যায়, তখন দূর থেকে মনে হয় খেলনার গাড়ি। তার কেবল ইচ্ছে হচ্ছে, কতক্ষণে সেই গাড়িটা তার দৃষ্টিগোচর হবে।

এ সব ভাবার সময়ই মনে হলো, বাবা ওয়াকার কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। হাইতিতি নামটা ভারি সুন্দর। জব্বর নাম ঠিক করেছে ওয়াকা। তবু বাবার বোধহয় কোনো সংশয় ছিল নাম নিয়ে। তিনি ওয়াকাকে প্রশ্ন করেছিলেন,'নামটি তোর সুন্দর। কিন্তু হাইতিতি বললে তো কিছু বোঝায় না। এই যেমন সব নামেরই একটা ব্যাখ্যা থাকে—তোর নাম ওয়াকা। মাউরি উপজাতিদের ভাষায় ওয়াকা মানে সুন্দর। হাইতিতির মানেটা কি বুঝতে পারছি না।'

॥ তিন ॥

ওয়াকা সত্যি বিপদে পড়ে গেল। সে ভেবেও কিছু বলেনি—তবু কেন যে বাচ্চাটার নাম সে হাইতিতি রাখতে চাইছে। তারপরই এক গাল হেসে বলেছিল, 'আমরা ডাং খেলি না?'

'তা খেলিস। তোর তো কাজকাম না থাকলেই ডাং খেলার নেশা। তখন তোর পাত্তা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় যে লুকিয়ে পড়িস!'

বেচারা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। ঠিক নালিশ গেছে তার নামে। সে তবু কিঞ্চিৎ চুপচাপ থেকে কি ভাবল—তারপর বলল, 'ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় আমরা চিৎকার করি—হাই।'

'হাই! সে আবার কি?'

'জিজ্ঞেস কর না ম্যাণ্ডেলাদিদিকে! কি তুমি চুপ করে আছ কেন? তুমি খেল না! আহা, কি ভাল মেয়ে সেজে বসে আছে!'

শহরটায় মাউরি উপজাতির লোকেদেরও বাড়িঘর আছে। তবে ম্যাণ্ডেলা বোঝে না, তারা কেন গরীব হয়। গরীব বলেই তো ওয়াকা সেই বাচ্চা বয়স থেকে তাদের বাড়িতে আছে। তার সঙ্গে বড় হচ্ছে। ওয়াকা ফাঁক পেলেই ডাং খেলতে চলে যায়। পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে গেলে সে দেখতে পায় ওয়াকার বন্ধুরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। এদের প্রায় সবার বাবামাই দিনেরবেলা কাজে বের হয়ে যায়। কেউ রাস্তা পরিষ্কার করে। কেউ আঙুরের জমি চাষ করে মালিকের হয়ে। মেয়েরা দোকানে কাজ করে। বাজারে নানা কিসিমের মাছও বিক্রি করে। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যও দলে দলে তারা বের হয়ে যায়। তখন বাড়ির কাচ্চাবাচ্চারা

স্বাধীন। যে যার মতো হুটোপুটি করে বেড়ায় অথবা সমুদ্রের ধারে ঘোরে। কেউ গিয়ে জেটিতেও বসে থাকে। নাবিকদের পিকাকোরা পার্কে চিনিয়ে নিয়ে যায়।

ম্যাগুেলা বলছিল, 'জানো বাবা, একটা ছোট্ট লাঠি, সাইপ্রাস গাছের ডাল কেটে তৈরি। জান বাবা লাঠিটা না খুব ভারি। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। এক লাইনে কেউ আগু পিছু থাকতে পারবে না। তারপর না, দলের রাজা ঠিক হবে। তারপরে না, রাজা ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় চিৎকার করে উঠবে—হাই। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক পায়ে লাফাতে থাকবে। তি তি তি—সবাই এক পায়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর মুখে তি তি বলছে। যে আগে যেতে পারবে, আগে কব্জা করতে পারবে ডাং সেই হবে ফের দলের রাজা।'

বাবা বলেছিল, 'বা, সুন্দর খেলা তো। তা এই হাইতিতি খেলার সঙ্গী হতে পারি না আমি?'

বাবা জাহাজ থেকে ফিরে এলে মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষ হয়ে যেত। একবার তো সত্যি ওয়াকার সঙ্গে ডাং খেলতে চলে গেল।

মার এক কথা, 'তোর বাবা গেল কোথায়!' ম্যাগুেলাও জানে না, গেল কোথায়। বাবা বাড়ি নেই, ওয়াকাও নেই, এমনকি হাইতিতি নেই—তা ওয়াকা বাচ্চা হাইতিতিকে নিয়ে মাঝে মাঝে শহরে ঘুরতে বের হয়। কখনো ম্যাগুেলা সঙ্গে থাকে। শহরটা না চিনলে হবে কি করে! তারা হাইতিতিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কেও বেড়াতে গেছে। মুশকিল, হাইতিতিকে দেখলে সব বাচ্চাদের কেন যে ল্যাজ গজিয়ে যায়। ভিড়ে হাঁটা যায় না কখনও। আর নানা প্রকারের দুষ্টুমি—কেউ কান টেনে দেয়—লম্বা কান বলে টানতে খুবই সুবিধা। কেউ ল্যাজ টেনে দেয়। কেউ আবার চিমটি পর্যন্ত কাটে। তখনই রেগে যায় ওয়াকা। '—কি হচ্ছে, এটা কি বাঁদর, এটা কি কুকুর! হ্যাঁ, তোরা বাচ্চাটার পেছনে লেগেছিস! জানিস ফু মন্তরে বাঘ বানিয়ে দিতে পারি—জানিস ইচ্ছে করলে হাতি হয়ে যেতে পারে। বাঁদরামি করছিস, জাদুকরের কথা মনে নেই—' আর তখনই সবাই খুব ভাল ছেলে। একেবারে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তারা তো দেখেছে জাদুকরের সঙ্গী ওয়াকাকে। ওয়াকা বললেই তো জাদুকর যে যা চাইত দিত। দুষ্টুমি করলে জাদুকরকে বলত, 'না, দেবে না। তোমার পেছনে লুকাই প্যাক দিচ্ছিল। তুমি টের পাওনি। ওকে পাতার বাঁশিও দেবে না।' জাদুকর পাইন পাতা দিয়ে সব সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়ে গেছে তাদের। এখনও তারা পাইন ফেস্টিভ্যালের দিন, পাতার বাঁশি বের করে সমস্বরে আশ্চর্য মিউজিক তৈরি করে। তখন শহরের লোকজন না বলে পারে না, ভাগ্যিস জাদুকর বসন্তনিবাস জাহাজে করে এসেছিল, পাতার বাঁশি বানিয়ে দিয়েছিল বাচ্চাদের, না দিলে এমন একটা সুন্দর বন্দর শহরে এই আশ্চর্য মিউজিকের খবরই কেউ পেত না। এখন তো নানা সাজপোশাকে পাইন পাতার পোশাক পরে সবাই যখন শহরের বড় গীর্জার দিকে হাঁটে তখন এই মিউজিক শোনার জন্য রাস্তার পাশে, ঘরের ছাদে, জানালায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। জাদুকর বলেই সম্ভব, যেন এই শহরে সবই ছিল—ছিল না কোনো অকল্পনীয় মিউজিক। যার স্রষ্টাও জাদুকর নিজে। সে সেবারে মিছিলটি নিজেই পরিচালনা করছিল। তার লম্বা আলখাল্লার উপর পাইন পাতার নানা বাহার। ওয়াকাই বুঝিয়েছিল, 'তুমি জান না বসন্তনিবাস, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। সারাদিন সারারাত উৎসব চলবে। যে যার মতো বাহারি মিছিল বের করবে। আমরা বের করব বাঁশির মিছিল। সবার হাতে থাকবে পাইন পাতার বাঁশি, তুমি তো সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়েছ আমাদের। মন ভাল না থাকলে আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরি আর বাঁশি বাজাই। বাঁশির সুর কতদূর থেকে শোনা যায়! আর কি সুমিষ্টি। তখন মানুষের তো দুঃখকষ্টও থাকে না। তোমার হাতেও থাকবে লম্বা পাইন পাতার বাঁশি। ক্লারিওনেটের মতো লম্বা। তুমি যে সুর দেবে, সেই সুরে আমরা বাঁশি বাজাব। শহরের লোকজন বুঝতে পারবে, কত বড় ওস্তাদ লোক তুমি!'

সুতরাং ম্যাগুেলার কেন যে মনে হয়েছিল, বাবা, ওয়াকা কোথাও কোনো নির্জনে বসে পাতার বাঁশিও বাজাতে পারে। কে জানে, বাবা হয়তো চুপি চুপি বলছে—'এই ওয়াকা, আমাকে দিবি একটা পাতার বাঁশি। আমি বড় হয়ে গেছি বলে কি বাঁশি বাজাতে পারি না। ছোটরা যা পারে, বড়রাও তাই পারে। ছোটদের মতো বড়দেরও ইচ্ছে হয় পাতার বাঁশি বাজিয়ে যদি দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়।' তা জাহাজে উঠলে তো ফেরার দিনক্ষণ ঠিক থাকে না। কবে জাহাজ ফিরবে কেউ জানেও না। পাঁচ-সাত মাস এমনকি কখনও বছর কাবার হয়ে যায়। তখন তো বাবার মন বাড়িঘরের জন্য খারাপ লাগতেই পারে। পাতার বাঁশি বাজাতে জানলে, মানুষের যে দুঃখকষ্ট অনেক লাঘব হয় বাবাও বোধ হয় টের পেয়েছিলেন।

বেশ বেলা হয়ে গেছিল বাবার ফিরতে। মা কেবল ঘরবার করছিল।

'গেল কোথায়? দ্যাখ না ম্যাগুেলা সে গেল কোথায়। আরে ওয়াকার না হয় কাণ্ডজ্ঞান থাকতে না পারে, তাই বলে সে না বলে কয়ে সকালে বের হয়ে গেল!'

ম্যাগুেলার কি যে তখন রাগ হচ্ছিল! তাকে ফেলে চুপচাপ বাবা চলে গেল। একবার বলতেও পারল না, 'আমরা যাচ্ছি, তুই যাবি!' ওয়াকা বাবার এত প্রিয় হয়ে গেল! সে তার বাবার কেউ না!

ম্যাগুেলার তখন এক জবাব, 'জানি না, কোথায় গেছে তারা। আমি জানব কি করে।' মাছ ধরতে গেলে ছিপ হুইল ঘরে পড়ে থাকত না। মাছের খবর ওয়াকা ভালো জানে। সমুদ্রে সারডিনের ঝাঁক কখন উঠে আসে সেই ঠিক খবর দিতে পারে। মাছ ধরার নেশা ওয়াকারও কম নেই। তার দাদুর ছোট্ট সরু সাদা নৌকাটির সে মালিক। দাদু ছিলেন মাছ মারার ওস্তাদ লোক। মৃত্যুর আগে নৌকাটি নাকি ওয়াকাকে দান করে গেছেন। আর নৌকাটিরও আছে নানা বাহারি শখ। সে যেদিকে যেতে চায়, যেতে দিতে হয়। যেমন চিংড়িমাছ বড় বড়—প্রায় হাতখানেক এক একটা লম্বা—নৌকাটিই তার খবর জানে, কোথায় আছে কি মাছ!—সমুদ্রে কবে যে নৌকাটি ভাসানো হয়েছিল কেউ জানে না। সরু ছিপনৌকা। খুবই ছোট। একজনের বেশি আরোহী উঠতে পারে না। আর এর আশ্চর্য ক্ষমতা বিশাল বিশাল ঢেউ অবলীলায় পার হয়ে যাওয়া। যতই ঝড় থাকুক সমুদ্রে, হাল ঠিক রাখতে পারলে সাধ্য কি ঢেউ নৌকাটিকে গ্রাস করতে পারে! চেষ্টারও ত্রুটি নেই। নৌকাটি ভাসলেই সমুদ্রের তর্জন গর্জন শুরু হয়। আবার তুমি! দেখাচ্ছি মজা। দু-হাত তুলে, হা রে রে করে ঢেউগুলি নৌকাটিকে তেড়ে আসে। ওয়াকা নিপুণভাবে সমুদ্রের উপর তার নৌকা ভাসিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। এটাও তার এক ভারি মজার খেলা। ফেরার সময় নৌকায় থাকে নানা রঙের ঝিনুক, শঙ্খ, চিংড়িমাছ বড় বড়। আর সারডিন মাছ। সে নৌকার খোল থেকে মাছগুলি যখন সমুদ্রের কিনারে নামিয়ে আনে, ম্যাগুেলার কি আনন্দ। বেছে বেছে তাজা আর সুস্বাদু মাছগুলি ম্যাগুেলা দিদির জন্য রেখে দেয়। বাকি সব দিয়ে দেয় তার জাতভাইদের। সে মাছ কখনও বিক্রি করে না।

ওয়াকা সমুদ্রে গেছে খবর পেলেই তার জ্ঞাতিভাইরা সব ছুটে আসবে বেলাভূমিতে। ওয়াকা যখন মাছ ধরতে গেছে, তখন সে খোল ভর্তি করে মাছ শিকার করে ফিরবেই। সবাই

ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকে। ওয়াকা নৌকা টেনে বালিয়াড়িতে তুলে আনলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওয়াকা তখন খুব গম্ভীর। সে বেশ বড়দের মতো তখন কথা বলে।

'লাইন দিয়ে দাঁড়াও।'

সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে যায়।

'এস এক এক করে।'

সবাই এক এক করে এলে ভালমন্দ মিশিয়ে মাছ তুলে দেয়।

কাজেই বাবা ওয়াকার পাল্লায় পড়ে মাছ শিকারেও যেতে পারে। ওয়াকার তো মাথার ঠিক নেই—এক ভেবে বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে, আর এক ভেবে নৌকায় উঠে গেছে! বাবা যে তার কত ছেলেমানুষ তখনই টের পায় ম্যাণ্ডেলা। তা না হলে বাড়ির কাজের ছেলেটি কখনও মনিবের মতো কথা বলতে পারে—'চলুন কর্তা বাঁশি বাজাইগে। চলুন কর্তা ডাং খেলিগে। চলুন কর্তা মাছ শিকারে।' আরে কারো বাবা কি এমন হলে হয়! নিজের মর্জির কথা বুঝতে হয় না। ওয়াকার মর্জিতে যেখানে সেখানে চলে যাওয়া কি ঠিক!

কাজেই ম্যাণ্ডেলার গোঁসা হবে না তো কার হবে! তার দায় পড়েছে, কোথায় গেল তারা রোদে বের হয়ে খুঁজতে হবে। ডাকাডাকি করতে হবে।

বাবা কেন যে জাহাজ থেকে ফিরলে এত ছেলেমানুষ হয়ে যেত সে বুঝত না। এটাই ছিল তার ক্ষোভের কারণ। যেন ওয়াকা বাড়ির কাজের ছেলে নয়, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সেই বাবা আর ওয়াকা ফিলে এল। পাইনের জঙ্গল ভেঙে উপরে উঠে এল! হাইতিতিও ফিরছে। তিনজন একেবারে যেন বিশ্বজয় করে ফিরেছে। তিনজনের কাছেই পাইন পাতার বাঁশি। বাবারটা হাতে, ওয়াকারটা পকেটে গোঁজা আর হাইতিতির বাঁশিটা বগলে।

এখন কেন যে মনে হয়, জাদুকর শহরের শিশুদের খুশি করার জন্য, যে যা চেয়েছে দিয়ে গেছে। যেমন ওয়াকাকে দিয়ে গেছে পাতার বাঁশি। পাইন পাতা দিয়ে কি করে সুন্দর বাঁশি বানানো যায় সে-ই শুধু জানে। আর সবাই যে চেষ্টা না করেছে তা নয়, কিন্তু পাতা মুড়ে বাঁশি হয় তবে কোনো সুর থাকে না। ফুঁ দিলে সুমিষ্ট সুর ভেসে বেড়ায় না। ওয়াকাকে এই জাদুবিদ্যা দেওয়ায় সে কি খুশি! ওয়াকা তো জানে না, তাকেও দিয়ে গেছে পালকের টুপি, হাইতিতিকেও দিয়ে গেছে রুপোর ঘণ্টা। ওয়াকা মনে করে জাদুকর কেবল তাকেই ভালোবাসত। ম্যাণ্ডেলাদিদিকে সেই তো জাদুকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই ম্যাণ্ডেলাদিদি যে আরও আশ্চর্য টুপির মালিক ওয়াকা জানেই না। ওয়াকার এত অনুগত ছিল বসন্তনিবাস যে সে ছাড়া কাউকে কোনো জাদুবিদ্যার অধিকারী করবে বিশ্বাস করতে পারত না। অন্তত যেদিন বসন্তনিবাস জাহাজে চলে গেল সেইদিন তো মনে হয়েছিল, ওয়াকাই জাদুকরের প্রিয়জন। সে শহরের সব শিশুদের এনে জড় করেছিল জাহাজঘাটায়। বড় বড় ক্রেনের নিচে দাঁড়িয়ে তারা সাদা রঙের পোশাকে বিদায় জানিয়েছিল জাদুকর বসন্ত-নিবাসকে। তারা সবাই একটি আশ্চর্য মেলডি পাতার বাঁশিতে সৃষ্টি করেছিল। সেই সুরে কান্না পায়নি, এমন একটি শিশুও ছিল না জেটিতে। ম্যাণ্ডেলা আর ওয়াকা মাঝখানে। তাদের দুজনের মাঝখানে হাইতিতি। হাইতিতি পর্যন্ত অপলক দেখছিল, জাহাজে সেই ক্ষেপাটে নাবিক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত জাহাজের ছোটবাবু ওয়াকাকে কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল,'নজর রেখ। জাহাজ থেকে পালিয়ে কোথায় যে গিয়ে বসে থাকে—আমরা খুঁজতে বের হই। দেখছ তো কেমন কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে জাহাজ থেকে নেমে আসে! লক্ষ্মী ছেলে, খবর দিতে পারলে জাহাজের কাপ্তান খুশি হবে।' ওয়াকা জাদুকরকে ক্ষেপাটে লোক বলায় খুবই ক্ষুব্ধ হতো। তবে প্রকাশ করত না। সে বলত,'ছোটবাবু, জাদুকর কখনও ক্ষেপাটে হয়! আমরা যা চাই তিনি তাই দেন। চাইতে জানতে হয়।' তবে আপনি সার, যখন বলেছেন, জাহাজে পৌঁছে দিতে, যতই রাত হোক বসন্তনিবাসকে আমরা জাহাজে ঠিক পৌঁছে দেব। যত রাতই হোক ওয়াকা বসন্তনিবাসকে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিত। জাহাজের ছোটবাবু এবং আরও দু চারজন নাবিক টর্চ হাতে সি-ম্যান মিশানের সামনে অপেক্ষা করত। ওয়াকা বসন্তনিবাসকে যত রাতই হোক জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেবে এমন বিশ্বাস তাদের যথেষ্টই ছিল।

সেই ওয়াকা পাতার বাঁশি পেয়েই খুশি। জাদুকরের জন্য মন খারাপ হলে, সে চুপচাপ জাদুকরের মূর্তির পায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকে। শহরের মানুষেরা অবাক হবে না! জাদুকর জাহাজে চলে গেল, ওয়াকা তার ব্যান্ড বাজিয়ে বিদায় জানাল—হাজার হাজার বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হলো বাতাসে—আর সাদা জাহাজ যত দূরে যায়, তারা দেখতে পায়, জাদুকর একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। শিশুদের উদ্দেশে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—যেন বলতে চায় সব শিশুদের মনেই আছেন একজন জাদুকর—যে তাকে যে-ভাবে চিনতে পারে। সাদা জাহাজ নীল জলে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওয়াকা ফিরে এসেছিল—আর কি কান্না! বোধহয় জাদুকর ওয়াকার কষ্ট টের পেয়েই মাস কাবার না হতেই বেলাভূমিতে এসে তিনি পড়ে থাকলেন। সেই এক পোশাক। একই রকমের নাগরাই জুতো, মাথায় ময়ূরের পালক—একেবারে রাজবেশ। জাদুকর ছিলেন রক্তমাংসের, হয়ে গেলেন শেষে সাদা পাথরের মূর্তি।

আর তাই না দেখে শহরবাসীদের চোখ কপালে উঠে গেল। একজন জাদুকর যদি পাথরের মূর্তি হয়ে শহরের শিশুদের কাছে ফের ফিরে আসেন, তবে তাঁকে অবহেলা করা যায় না। বাচ্চাদের শুভ-অশুভ বলে কথা। সব বাবা-মারাই তো চায় তাদের শিশুরা বড় হয়ে উঠুক—পৃথিবীর তাবৎ স্বপ্ন নিয়ে। নগরপাল সভা করলেন তখন, এই মূর্তি নিয়ে কি করা! শিশুরা দাবি করল, বেলাভূমিতেই মূর্তিটি বসিয়ে দেওয়া হোক। গড়ে তোলা হোক সুন্দর একটি বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ লাগিয়ে দেওয়া হোক। আর যেসব পাখিরা ফুল ভালোবাসে মধু খেতে ভালোবাসে তাদের বলা হোক, এখানেই এসে তোমরা থাকবে। কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না।

॥ চার ॥

দূর থেকে যত শহরের কাছে উড়ে যাচ্ছে তত ম্যাণ্ডেলা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। প্রথমেই দেখতে পাবে সেই বিশাল পর্বতশ্রেণী। এগমন্ট হিলের শৃঙ্গগুলি বরফে ঢেকে থাকে। রোদের বর্ণছটায় ঝিকমিক করে পাহাড়চুড়ো। কখনও মনে হয় সোনালি পাহাড়। কখনও রূপালি পাহাড়। তার সেই বর্ণছটায় রাতেও কেমন শহরটা বিভোর হয়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়বে অনন্ত হয়ে আছে সেই পাহাড়ের দেশটা। সে এত জায়গায় উড়ে গেছে নিজের এই পাহাড়টির উপরে কখনও উড়ে যায়নি। দু' চোখ মেলে তার প্রিয় এই পাহাড় দেখার ইচ্ছে কেন যে হয়নি বোঝে না। দূর থেকে পাহাড় যত রহস্যময় ঠেকে, কাছে গেলে তা হারিয়ে যেতে পারে। এই আতঙ্কেই হয়তো সে কখনও পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যায়নি। যেন পাহাড়টা আছে থাক। সে তার রহস্য নিয়ে সারাজীবন ম্যাণ্ডেলার মনে বেঁচে থাক। উড়ে গেলেই দেখতে পাবে, সেই একই বনভূমি, নদীর খাদ কিংবা যেমন আর দশটা পাহাড় থেকে ঝর্ণা নেমে আসে তেমনি কোনো নিরাভরণ ঝর্ণা নিয়ে জেগে আছে পাহাড়টা। দিন রাত জল পড়ার ঝরোঝরো শব্দ যদি

কখনও একঘেয়ে মনে হয়, তবে যেন পাহাড়ের মহিমা খাটো হয়ে যাবে।

তারপর আরও কাছে গেলে সে দেখতে পাবে পাহাড়ের কোলে সব আপেল কমলালেবুর বাগান, পাকা সড়ক—লাল-নীল কাঠের বাড়ি। গাছগুলিতে আপেল আর আপেল। গোলাপি কিংবা টকটকে সিঁদুরের রঙ আপেলের গায়। উপত্যকায় এই আপেলের বাগানগুলি কি যে টাটকা আর তাজা! মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কৌরিপাইনের জঙ্গল, নিচে আবাদের ভূমি কিংবা মেষপালকরা অস্থায়ী কুটীর বানিয়ে চলে আসে এখানে। সারাদিন তারা ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস খাওয়ায়। রাতে মাঠের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে ভেড়ার পাল। গুঁতোগুঁতিও করে—তখন মেষপালকের কাজ ছুটে যাওয়া। ঝগড়া থামিয়ে দিতে না পারলে শিং-ফিং ভেঙে রক্তপাত। বড় বিশ্রী ব্যাপার। মেষপালক কুটীরে শুয়ে থাকে খড়ের বিছানায়। কখনও সে নির্জন প্রান্তরে সেই বাঁশি বাজায়। যা দিয়ে গেছে বসন্তনিবাস সবার হাতে হাতে।

নিচে সেই সমুদ্র কিংবা দ্বিপটিকে শুধু সে দেখতে পাচ্ছে। দুটো একটা জেলেডিঙিও দেখতে পেল। সকাল হচ্ছে। এবারে দূরে এক ঝলক আলোর মতো পাহাড়টা চোখে ভেসে উঠল। তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তুষারশৃঙ্গে সূর্যোদয়ের সময় তাকালে যা হয়! সে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হাইতিতি উড়ে যাচ্ছে আরও বেগে। সে বোধহয় ভেবেছে ম্যাঙেলার আগে পাইনের বনভূমিতে টুপ করে নেমে পড়বে। হাইতিতির এই এক দোষ। কিছু বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে গোয়ার্তুমিও করে ফেলে—সে যা বলে হাইতিতি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। বোঝে না—সমুদ্রপাখিরা পথ ভুল করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের উপর উড়ে যাওয়া এমনিতেই কঠিন—কেবল ম্যাঙেলা জানে, সে বাড়ি ফিরছে, বাড়ির জন্য তার মন খারাপ, মাকে দেখার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে আছে—পালকের টুপি জানে, সে কি চায়। জানে বলেই সে বাড়ি ফিরে যেতে পারছে—হাইতিতির তা না। হাইতিতির মা-বাবার কথাও বোধহয় মনে নেই। সমুদ্রে ঝাঁক ঝাঁক পাখি দেখলেই সে তাদের সঙ্গে খেলা করে বেড়ায়। উড়ে বেড়ায়, ওরা যদি কোনো দ্বীপের দিকে ধাওয়া করে, সেও পিছু নেয়। পিছু নিলে তাদের যে নিজের দেশে ফেরা হবে না হাইতিতি বোঝে না। এত বোকা। ডাকলেও শোনে না। তখন আর কি করা। অগত্যা ছুটে যেতে হয়, ডাকতে হয়, হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। পাখিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভাল। কিন্তু পাখিরা জলে ভেসে থাকতে পারে, ঘুমাতে পারে, তুমি পারবে ডালে বসে থাকতে, ঘুমাতে পারবে। খাবে কি! পাখিরা ছোঁ মেরে সমুদ্র থেকে মাছ তুলে নিতে পারে দরকারে! তুমি পারবে। তোমার কি আর কখনও কাণ্ডজ্ঞান হবে না!

কে শোনে কার কথা।

অগত্যা ছুটে গিয়ে কান টেনে ধরতে হয়—বলতে হয়, 'ওদিকে নয়, এদিকে। ওদের সঙ্গে কোথায় রওনা হলে! ফিরছি বাড়ি, মন ভালো নেই, মা কত চিন্তা করছে—আর তুমি পাখিদের দেশে উড়ে যেতে চাও। সে না হয় যাওয়া যাবে। ওড়া তো তোমার ফুরিয়ে যায়নি। ম্যাঙেলাদিদি তোমাকে একবার পাখিদের দেশও ঘুরিয়ে আনবে। এখন চল। লক্ষ্মী ভাইটি।'

হাইতিতি রেগে যায়।

'তুমি আমার কান ধরলে কেন?'

'একশবার ধরব।'

'আমি যাব না।'

'হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

হাইতিতির রাগ জল। সত্যি তো ম্যাঙেলাদিদি না থাকলে সে খুবই বিপদে পড়ে যাবে। সে একেবারে তখন খুবই অনুগত হয়ে যায়। 'আমি চিরদিন থাকছি না' ম্যাঙেলাদিদি শুধু বলে না, বুচার মামাও বলে। লুসি মাসিও বলে। ম্যাঙেলাদিদি উৎপাত শুরু করলেই লুসি মাসি বলবে, 'ম্যাঙেলা নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না, যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

ছোটরা যে বড়দের কথাই অনুকরণ করে—ম্যাঙেলাদিদির শাসনে এটা সে ভালোই টের পায়। ছোটরা বড়দের কাছেই সব শেখে। বজ্জাতিও। তবে ম্যাঙেলাদিদি খুবই সরল। আর মনটাও খুব ভালো। তার যে ভালো চায় হাইতিতি তাও বোঝে। সে আর পাখিদের ঝাঁকের পেছনে ধাওয়া করে না। কিংবা পাখিদের মতো ডিগবাজিও খায় না। সত্বর বাড়ি ফেরা দরকার। মা-র জন্য মন খারাপ—পাখিদের সঙ্গে ওড়াউড়ির খেলা পছন্দ নাই করতে পারে। সে দুষ্টুমি করলে রেগে তো যাবেই। পাখিরা কেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। আর পাখিরা তাকে দেখতে পায় কিনা তাও সে বোঝে না। তার গলায় ঘণ্টা বাজলে শব্দ হয় ঢং ঢং। তাকে দেখতে না পাক ঘণ্টার শব্দ ঠিকই টের পায়। তখন পাখিদের মধ্যে কলরব পড়ে যায়। উড়তে উড়তে যদি পাখির ঠ্যাং ধরে ফেলে—তবে খুব জব্দ। কিন্তু ম্যাঙেলাদিদি তেড়ে আসবে।

'এই হাইতিতি, হচ্ছেটা কি! ছেড়ে দাও। কাউকে জব্দ করাও মোটা বুদ্ধির লক্ষণ। তোমার খেলা আর একজনের প্রাণসংশয়। ঠ্যাং ভেঙে গেলে, পাখা মচকালে, পাখিটা আর উড়তে পারে! দেব তোমার ঠ্যাং ভেঙে। বুঝবে মজা। কারও অনিষ্ট করলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে বোঝো না। বয়েস তো কম হলো না—ধেড়ে বাঁদর কোথাকার!'

'তুমি আমাকে বাঁদর বললে!'

'বাঁদরামি করলে বাঁদর বলব না তো কি বলব!'

'পাখিদের সঙ্গে তো খেলা করছিলাম। বাঁদর বললেই হলো।'

'এটা খেলা! খেলা বোঝো না। একজনের খেলা, আর একজনের প্রাণসংশয়—এটা তোমার কাছে খেলা হতে পারে—কিন্তু পাখির জীবন সংশয় বোঝো! তুমি তাকে আদর করতে চাইছ বুঝবে কি করে। সে তো ছটফট করবেই। এস।'

আবার হাওয়ায় ভেসে চলে তারা।

এগামন্ট হিল চোখের ওপর ক্রমশ বড় হচ্ছে। এবারে শতরঞ্জের মতো পাহাড়তলী ভেসে উঠবে চোখে। একেবারে দাবার ছকের মতো মনে হয়। গাছপালা স্পষ্ট নয়, ধীরে ধীরে সব এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার শরীর আর ততটা হাল্কা নেই যেন। গতি কমে আসছে।

আর তার যে কি হয়। দেশে ফেরার সময় মনে হয়, সে হয়তো বাড়িতে গিয়েই দেখবে, বাবা তার ফিরে এসেছেন। ম্যাঙেলাকে বাড়িতে দেখতে না পেলে ছটফট করবেন সে জানে। বাবা যদি জানে, ম্যাঙেলা তাকে খুঁজতে বের হয়েছে খুশিই হবে। তবে বাবা রাগও করতে পারে। বলতেই পারে, 'তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে ম্যাঙেলা, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজতে বের হয়েছিলে! তোমার এই দুর্জয় সাহস হলো কি করে?' তখন তো সে বলতে পারবে না, 'জান বাবা জাদুকর না আমাকে একটা পালকের টুপি দিয়ে গেছে। হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা। আমার মুখ ব্যাজার দেখে জাদুকরের মনে দয়া হয়েছিল।'

এটাও ঠিক, বাবা ফিরে এলে সে আর ওড়াউড়ি করতে পারবে না। জাদুকর বলেই দিয়েছে, 'টুপিটা পরলে তুমি যেখানে খুশি ইচ্ছে করলে উড়ে যেতে পারবে, বাবাকে খুঁজে বেড়াতে পারবে। বাবা তোমার ফিরে এলেই

পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে। বাবা ফিরে না আসা তক তুমি ছোট থাকবে। বয়স বাড়বে না। বড় হয়ে গেলে তুমিও একজন তখন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। অবিশ্বাসীদের জন্য কখনও কোনো পালকের টুপি থাকে না।' জীবনে কিছু পেতে হলে, কিছু হারাতে হয়, এও জাদুকর তাকে বলে গেছেন। সে তার বাবাকে ফিরে পেলে, পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে।

ম্যাণ্ডেলা যদি গিয়ে দেখে বাবা সত্যি ফিরে এসেছেন—ইস—সে আর একদণ্ড স্থির থাকতে পারছে না! সে সব হারাতে রাজী, তার পালকের টুপিও—বাবা ফিরে এলে, তার আর কিছুর দরকার হবে না। যেন গিয়েই দেখতে পাবে, দেয়ালের হুকে বাবার জাহাজি টুপি ঝুলে আছে। বাবা ফিরে এলে কত কিছু নিয়ে আসতে পারে। তাহিতি দ্বীপের রঙিন পাথর বাবা তাকে এনে দেবে বলেছেন। দামি পাথরের মালা পরে সে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তার জন্য হনলুলু দ্বীপের টিয়া পাখির মুখোসও নিয়ে আসতে পারেন। মুখোস পরে সে, ওয়াকা আর হাইতিতি চলে যাবে জাদুকরের মূর্তিটির নিচে। তারপর তারা গান গাইবে। পাতার বাঁশি বাজাবে ঘুরে ঘুরে। জাদুকরের দয়াতেই বাবা যে একদিন ফিরে আসবেন, এই বিশ্বাস তার আছে। সে জানে না, জাদুকরের মনে কি আছে? তিনি যদি চান, তার বাবা ফিরে আসুক, তবে যত সাত সমুদ্র তের নদীর পারেই বাবা তার থাকুক না, ঠিক ফিরে আসবে।

আর তখনই এটা কি দেখতে পাচ্ছে!

সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বিশাল একটা হাঙর তেড়ে যাচ্ছে কাকে। আরে করছে কি, জল যেন পাহাড় কেটে দু-ভাগ হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে—আরে মাছটা কি ক্ষেপে গেছে! ক্ষেপে যাবার কি কারণ। তার বাবার কথা মনে থাকল না, বাড়ির কথা মনে থাকল না—এমন একটা রাক্ষুসে দৈত্য তাদের সমুদ্রে এসে হাজির—আর হাঁ করে কাকে তাড়া করছে! তারপরই ম্যাণ্ডেলার চক্ষুস্থির। ওয়াকা আর তার ছিপ-নৌকাটি গভীর সমুদ্রে মোচার খোলের মতো নামছে উঠছে, কাত হচ্ছে। সে কি ধরে আছে ঠিক মতো? আর নিচে নামতেই টের পেল ওয়াকা তার ঠাকুরদার ছিপ নিয়ে গভীর সমুদ্রে চলে এসেছে। ছিপটার সুতো ছেড়ে দিয়েছে—এবং নীল হাঙরের গলায় আটকে গেছে বিশাল একটা বঁড়শি। মাছটা তো ক্ষেপে যাবেই। ছল চাতুরী করে মাছটাকে লোভে ফেলে দিয়ে ওয়াকা এতক্ষণ মজা দেখছিল বোধহয়। বঁড়শি গেঁথে গেলে মাছটা এত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে হয়তো অনুমানই করতে পারেনি।

'বোঝো মাছ ধরার মজা!'

'বোঝো এবার কার পাল্লায় পড়ে গেছ!'

'দেখছ না, কি দ্রুত ছুটে আসছে। আরে ওয়াকা সুতো কেটে দাও। ছেড়ে দাও। তুমিও যাবে, মাছও যাবে।'

তারপরই মনে হলো, সে কাকে বলছে! কে তার কথা শুনবে! তার কথা আকাশে ভেসে থাকলে কেউ শুনতে পায় না। তবে হাইতিতির ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। বোধহয় ঘণ্টার শব্দেই চকিতে একবার উপরের দিকে তাকিয়েছিল, তার খেয়ালও নেই যেন দ্রুত ছুটে আসছে একটা অতিকায় হাঙর। থামের মতো কালো শিরদাঁড়া ভেসে আছে। লফিয়ে ঢেউএর মাথায়ও উঠে গেল। সাদা পাথরের মতো পেটের মাংস থলথল করছে। ধারালো অজস্র দাঁতগুলি রৌদ্রকিরণে চকচক করছে—যেন খুঁজছে কোথায় আছে সেই আততায়ী এবং লাফিয়ে ঢেউএর মাথায় ভেসে উঠেই তলিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে।

'ওয়াকা মরবে।'

'মরণের ওষুধ কানে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কি সাহস!'

'বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।'

'ওয়াকা, ওয়াকা?'

সে শুনতে পাবে কেন, মাথার উপর ম্যাণ্ডেলাদিদি উড়ে ওকে ডাকছে। সতর্ক করে দিচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দে কি তবে টের পেয়ে গেছে, যাক কাছে কোথাও ম্যাণ্ডেলাদিদি আর হাইতিতি আছে। তার আর ভয় নেই, সে বুঝছে না কেন, রাক্ষুসে মাছটা ল্যাজের এক ঝাপটায় তার নৌকা তলিয়ে দিতে পারে। নৌকা তো নয়, যেন একটা ডোঙা। বাবা যদি ফিরে আসেন, ওয়াকার এই দুর্জয় সাহসও তিনি পছন্দ করতে না পারেন। ধমক দিতে পারেন, 'প্রাণ হাতে করে মাছটার সঙ্গে লড়লে! তোমার এত সাহস, একা একা গভীর সমুদ্রে ঢুকে গেছো! মাছটা তোমার কোনো অনিষ্ট করেছে!'

অবশ্য পলকের ভাবনা, কিন্তু মাছটা যে ওয়াকার নৌকা দেখতে পাচ্ছে না বোঝাই গেল। কারণ একেবারে পাশ কাটিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

জলের ঝাপটায় ওয়াকার জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। ঢেউ এসে তাকে এবং নৌকাটাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সে টাল খেয়ে একবার পড়েও গেল। আবার উঠে দাঁড়াল। হুইল থেকে সুতো ছেড়ে দিচ্ছে। আবার গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ওস্তাদ মাছ শিকারীর মতো তার ভাবভঙ্গী। ওয়াকা নুয়ে কি খুঁজল! আবার মাছটা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে উঠে গেল। কিনার দেখা যাচ্ছে না। শহরবাসীরা কেউ জানেই না, ওয়াকা আজ মরণ খেলায় মেতেছে—হয় মাছ শিকার করে বেলাভূমিতে ফিরবে নয় সে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে।

ম্যাণ্ডেলা ইচ্ছে করলে নৌকায় নেমে যেতে পারে। কিন্তু এত পলকা নৌকায় সে নামলে, তার ভরে যে নৌকাটা ডুবে যাবে না কে বলতে পারে। সে পাটাতনে নেমেও যেতে পারছে না। সে ভাবল, যদি মাছটাকে মুক্তি দেওয়া যায়। কি যে করে! এত শক্ত সুতো যে হাঙরের দুর্ধর্ষ ধারালো দাঁত পর্যন্ত অকেজো। অথবা মাছটার হৃৎপিণ্ডে যদি বঁড়শি গেঁথে যায় তবে মাছটা নিজের ছটফটানিতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। দাঁতে বড়শি কেটে দেবার কথা বেমালুম ভুলে যেতে পারে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই সে আলগাভাবে ওয়াকার মাছ কাটার ধারালো ছোট্ট ছুরিটা তুলে ঘ্যাচ করে সুতো কেটে দিল। মাছটা ফিরে যাক নিজের দেশে, যে যার মতো সুখে থাক ভেবেই কাজটা করেছে। এছাড়া যেন ওয়াকার প্রাণ রক্ষা করার উপায় তার জানা ছিল না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মাছটা ঠিকই ওয়াকাকে দেখেছে। তার নৌকাটাও। এতক্ষণ ওয়াকাই ছিল সবল প্রতিপক্ষ। সুতোয় টান দিলেই মাছের অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপে! সে অবশ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ সবল বুঝতে কষ্ট হয় না। এবার যেন, মাছটা ছাড়া পেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠল। ঢেউ-এর উপর লাফিয়ে ডিগবাজি খেল দু-বার। জলে বিশাল ঘূর্ণি তুলে ভেসে বেড়াতে থাকল—ওয়াকা হতাশ। সে জানে তার বুঝি রক্ষা নেই—এতক্ষণ সে ছিল সবল প্রতিপক্ষ, এক মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় সে কত দুর্বল হয়ে গেছে, হতাশ মুখ দেখে টের পেল ম্যাণ্ডেলা।

সমুদ্রের নীল জলে মাছটা চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এবার মরণ খেলায় বুঝি মাতবে। নৌকাটার চারপাশে বেশ দূরে সে মুখ তুলে বিশাল হাঁ করল—তারপর ডুব দিল। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ ঝাপটা মারছে। ওয়াকা সত্বর তার সব গুটিয়ে নিয়ে ভেগে পড়ার তালে আছে। সে হয়তো জানে, অতিকায় মীনটি সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজে। এবং নীল জলরাশি ভেদ করে যে কোনো মুহূর্তে তার নাকের ডগায় লাফিয়ে পড়তে পারে। তারপর ওয়াকাকে গিলে খেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা ভেবে পাচ্ছে না—কি করবে! সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। ওয়াকার কিছু হলে

কি যে হবে! সে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সে নৌকার ঠিক মাথার উপরই ওড়াউড়ি করছে। হাইতিতি একবার নৌকায় নেমে যেতে চেয়েছিল, তার ল্যাজ ওয়াকার পিঠেও মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে। পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে—ওয়াকা জানে হাইতিতির ঘণ্টা এভাবেই বাজে। রাতে অদৃশ্য হবার মুখে শহর-বাসীদের মতো সেও শুনতে পায় আকাশে ঘণ্টাধ্বনি করে কারা চলে যাচ্ছে। শহরবাসীদের তখন এক কথা, লুসির ভুতুড়ে মেয়েটার কাজ। শিশুরা বলবে, জাদুকরের কৃপায় এটা হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে উড়তে পারে না, এমন অবিশ্বাসী তারা নয়। মানুষই সব পারে। জাদুকর ইচ্ছে করলেই পারে। লুসির ভুতুড়ে মেয়েটা বললে তারা ক্ষেপে যায়। ওয়াকাও ক্ষেপে যায়। সেই একই ঘণ্টাধ্বনি তার মাথার উপর অনবরত বাজতে থাকলে, সে চিৎকার করে উঠল— 'ম্যাগুেলাদিদি, শীগগির খবর দাও, সমুদ্রের দৈত্যটা আমাকে ঘিরে ফেলেছে। ঐ দেখ দূরে ভেসে উঠছে—ঐ দ্যাখ দূরে পিঠের শিরদাঁড়া ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ দ্যাখ আবার ফিরে আসছে।'

ম্যাগুেলা এবার দেখল, সেই অতিকায় মীন ফের সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল—অনেকটা উপরে উঠে দেখার চেষ্টা করল কত দূরে তার সেই প্রবল প্রতিপক্ষ—তারপর ছুটে আসতে লাগল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকার উপর। নৌকা উল্টে গেল।

ওয়াকা লাফিয়ে পড়ল জলে—চিৎকার করে উঠল, 'ম্যাগুেলাদিদি'। আর কোনো আওয়াজ উঠল না। ঢেউএর ঝাপটায় সে অনেক দূরে সরে গেছে। ওয়াকা সাঁতারে পটু—সে ঢেউএর উপর একবার হাত তুলে দিল, তারপর ঢেউএর ভিতর ডুব দিয়ে সে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল—অতিকায় মীনের আর পাত্তা নেই। ম্যাগুেলার বুকে ত্রাস—সে উড়তে থাকল—এবং যেখানে সেই মীন ফের ভেসে উঠল তার নাকে ল্যাজ দিয়ে হাইতিতি সুড়সুড়ি দিল। মাছটা মুখ ঝামটাল। হাঁ করা মুখ বন্ধ। মীন ভেসে উঠলেই হাইতিতি ছুটে যাচ্ছে, আর ল্যাজের ডগা দিয়ে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যেন কোনো রকমে আটকে রাখা—এবং সেই ফাঁকে যদি ওয়াকা তার নৌকা ভাসিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু নৌকাটা যে উল্টে আছে। তার পাটাতনের কাঠ ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রে। ওটাকে টেনে নেওয়া সহজ কাজ নয়। নৌকা ভেসে থাকলে, ম্যাগুেলাই দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে জলেও নামতে পারছে না। যদি পালকের টুপি সমুদ্রে ভেসে যায়। যেতেই পারে। আসলে ম্যাগুেলা ভুলেই গেছে তার পালকের টুপি ঝড় কিংবা ঢেউ কেউই উড়িয়ে নিতে পারে না। তার কেবল এখন লক্ষ্য কোনদিকে অতিকায় মীন ছুটে যাচ্ছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওয়াকাকে। ঢেউ এর প্রবল ঝাপটায় সে একান্ত স্থির থাকতে পারছে না। আর তখনই দেখল, আবার সেই অতিকায় মীন জলে ঘূর্ণি তুলে তালগাছের মতো সমুদ্রের পিঠে ভেসে উঠেছে। এবং তীরের ফলার মতো ছুটে যাচ্ছে ওয়াকার দিকে।

এসময় হা-হুতাশ করে লাভ নেই ম্যাগুেলা জানে— সে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। সে দেখতে পাচ্ছে পাটাতনের একটা লম্বা কাঠ ঢেউএর মাথায়। দ্রুত উড়ে গিয়ে সে কাঠটা তুলে নিল। প্রথমে ভেবেছিল, ভাসলেই কাঠটা দিয়ে মারবে মাথায়। সে মারলও। আশ্চর্য মাছটার যেন তাতে কিছুই আসে যায় না। পাথরের মতো শক্ত মাথা। অতিকায় মীন তার লক্ষ্যে স্থির। সে ওয়াকাকে গিলে খাবেই। ওয়াকাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ডুবে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে। সে খুঁজছে তার নৌকাটাকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশে ক্ষেপা সমুদ্র তাকে ঘিরে ধরেছে। ঘণ্টাধ্বনি দূরে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে না। প্রাণপণে সে ঢেউ কাটিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এই গভীর সমুদ্রে ঢুকে গিয়ে সে বুঝতেও পারছে না, কোথায় তার প্রিয় বেলাভূমি, পাইনের বন, আর টিলার ওপর মিকি মাউসের মতো লাল-নীল রঙের কাঠের বাড়ি। কোনদিকে সাঁতার কাটলে, সে সেখানে পৌঁছাতে পারবে তাও জানে না। কেবল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'ম্যাগুেলাদিদি তুমি সব পার। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। হাইতিতিকে

মাছটা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে উঠে গেল।

বল, ঘণ্টাধ্বনি করুক, তা অনুসরণ করি।'

কিন্তু প্রবল ঢেউ-এর গর্জনে ম্যাণ্ডেলা ওয়াকার কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না। সে এখন পাহাড়ের মতো বিচরণ করে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে—অতিকায় মীনের খোঁজে। কোথায় গেল। যেন প্রকৃতির রুদ্ররোষে তারা পড়ে গেছে। ঝড় উঠলে বড়রকমের সর্বনাশ। সমুদ্রের জলকণা বাতাসে ভেসে বেড়ালে সে কিছুই চোখে দেখতে পাবে না। না ওয়াকাকে, না সেই অতিকায় মীনকে।

আবার দেখল, দিগন্ত থেকে মাছটা ভেসে আসছে। সমুদ্রের জল উথাল-পাতাল করে ভেসে আসছে। সে খুঁজছে ওয়াকাকে। মাছের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সে ঠিক ওয়াকাকে খুঁজে পাবেই—যত দূরেই থাক ওয়াকা, ঘ্রাণশক্তি প্রবল বলে ঘোরাফেরা করতে করতে অতিকায় মীন ঠিক পেয়ে যাবে ওয়াকাকে।

ম্যাণ্ডেলা উড়ছে।

হাইতিতি উড়ছে।

হাইতিতি হাঁ করা মুখের কাছে ল্যাজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মাছটা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—অথচ কিছু যেন নাকের ডগায় স্পর্শ করছে। সেটা কি মাছটা বুঝতে পারছে না। হ্যাঁচ্চো দিচ্ছে কিনা তাও ম্যাণ্ডেলা জানে না। কারণ মাছের হাঁচি কাশি থাকে কিনা সে জানে না।

ম্যাণ্ডেলা যে উড়ে গিয়ে বুচারমামার বন্দুকটা নিয়ে আসবে তার উপায় নেই।

সদা ব্যস্ত রাখতে হচ্ছে মাছটাকে।

ভেসে উঠলেই সে পাটাতনের লম্বা কাঠটা দিয়ে পিঠে মাথায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, মারছে।

মাছটা তখন জলের নিচে লুকিয়ে পড়ছে।

কিন্তু অতিকায় মীন,ভবি ভুলবার নয়।

আবার হাঁ করে সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণি তুলছে—বেঁকে যাচ্ছে, চিৎ হয়ে খেলা করছে। যেন যে আছে সমুদ্রে, সে তার কব্জার মধ্যে। খুশিমতো গিলে ফেলা শুধু কাজ। ভেসে উঠে ডুবে গিয়ে সে যে মজা করছে না অদৃশ্য কোনো অশুভ আত্মার সঙ্গে কে বলবে! যেন বলছে, 'দেখ আমরা জলের জীব। তাবৎ শক্তি আমাদের জলে। অন্তরীক্ষে তুমি আর যাই কর, জলের নিচের সাম্রাজ্যে তোমার হাতিয়ার ভোঁতা।'

ম্যাণ্ডেলা এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আর দেখছে, ঐ তো ওয়াকা, ভাসছে—জলে ডুবছে। আর দূরে নৌকা উল্টে গিয়ে যেমন লম্বা একটা কুমীরের মতো রোদ পোহাচ্ছে।

আর তখনই ম্যাণ্ডেলা দেখল, আবার সেই মীন ভেসে উঠেছে। চোখ হিংস্র। দাঁতালো মাছটা ওয়াকাকে মুখ হাঁ করে গিলতে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা উপায়ান্তর না দেখে হাঁ করা মুখে পাটাতনের লম্বা কাঠটা ঢুকিয়ে দিল। ক্রিকেট মাঠে স্টাম্প পুঁতে দেবার মতো হাঁ করা মুখে ঢুকিয়ে দিল। খাপে খাপে বসে গেল কাঠটা।

নাও বোঝো মজা!

এতে এখন জব্দ হবে মাছটা ম্যাণ্ডেলা অনুমানই করতে পারেনি।। মাছটা আর তার চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। ছুটছে, ল্যাজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, জলে অজস্র বুদ্‌বুদ উঠছে। আবার ভেসে উঠছে। চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। কাঠটা দু চোয়ালে ঠেকার কাজ করছে। কাঠটা দু-চোয়ালে বসে গেছে। ভাসলেও মুখ হাঁ করা, ডুবলেও মুখ হাঁ করা।

ম্যাণ্ডেলা যত দেখে তত হাততালি দেয়। একটা অতিকায় মীনকে এভাবে সে জব্দ করতে পারবে আশাই করতে পারেনি।

সে এবার হাত ঝেড়ে নৌকাটার কাছে গেল। ওয়াকা সাঁতার কাটছে।

নৌকাটা ম্যাণ্ডেলা আর হাইতিতি টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আর মাছটা করুণ চোখে সমুদ্রে ভেসে থেকে অন্তরীক্ষের কাণ্ড-কারখানা দেখছে। যেন বলছে, 'আমার দু-চোয়ালে কেন কাঠ আটকে দিলে। না পারছি ওগলাতে, না পারছি গিলতে।

ম্যাণ্ডেলা বলল, 'মজা বোঝ। ওয়াকাকে তুমি চেন না। সুতো কেটে দিলাম, তাই রক্ষে। পারতে সুতো ছিঁড়ে পালাতে। যতদিন তুমি জব্দ না হতে ওয়াকা নৌকায় ভেসে বেড়াত! ওয়াকাকে তুমি চেন না। বেইমানি আর কাকে বলে! প্রতিশোধ নেবে! আরে মানুষই তো ভুল করে। তাই বলে তাকে শোধরাবার সুযোগ দিতে হবে না। সে না হয় বঁড়শিতে আটকে ফেলেছিল, তোমার কি বুদ্ধি বুঝি না বাপু, দাঁত এত তোমার ধারালো—সুতো কেটে দিতে পারলে না। অথচ বড়াই ষোল আনা!'

নৌকাটা হাতের নাগালে পেয়ে ওয়াকা অদ্ভুত কৌশলে উল্টে দিল, জল সেচে ফেলে দিল—আর দেখল, সেই অতিকায় মীন তার নৌকার পাশে ঘোরাফেরা করছে। আর হাই তোলার মতো মুখ ভাসিয়ে দেখাচ্ছে, কে যে তাকে এভাবে জব্দ করে গেল!

ওয়াকাও অবাক। সত্যি তো মাছটার চোয়ালে একটা পাটাতনের কাঠ আটকে রয়েছে। না পারছে ওগলাতে, না পারছে গিলতে। কে যে কাজটা করল! তবে সে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছে। ম্যাণ্ডেলাদিদিরই কাজ। সে অবাক হয়ে শুনল, মাথার উপর তখনও ঘণ্টা বেজে চলেছে।

ওয়াকা ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করল। তীরের কাছাকাছি এসে দেখল মাছটা তার দিকে তখনও করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সে মাছটার কাছে গেল। হাঁ করা মুখের কাঠটা সে বৈঠায় চাড়ি মেরে ভেঙে দিল। আর তখন মাছটা ছুটল—যেন উড়ে যাচ্ছে—ছোট্ট একটা বিমানের মতো। সমুদ্রের ধারে যারা ওয়াকার অপেক্ষায় ছিল তারা তো দৃশ্যটা দেখে অবাক। তারা এসেছিল মাছ নিতে, কিন্তু দেখল, নৌকার খোলে একটা মাছ নেই। পাটাতন সাফ। সে টলতে টলতে পাইন বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সারা গায়ে তার অজস্র ক্ষত।

ছবি : বিজন কর্মকার

সমাপ্ত
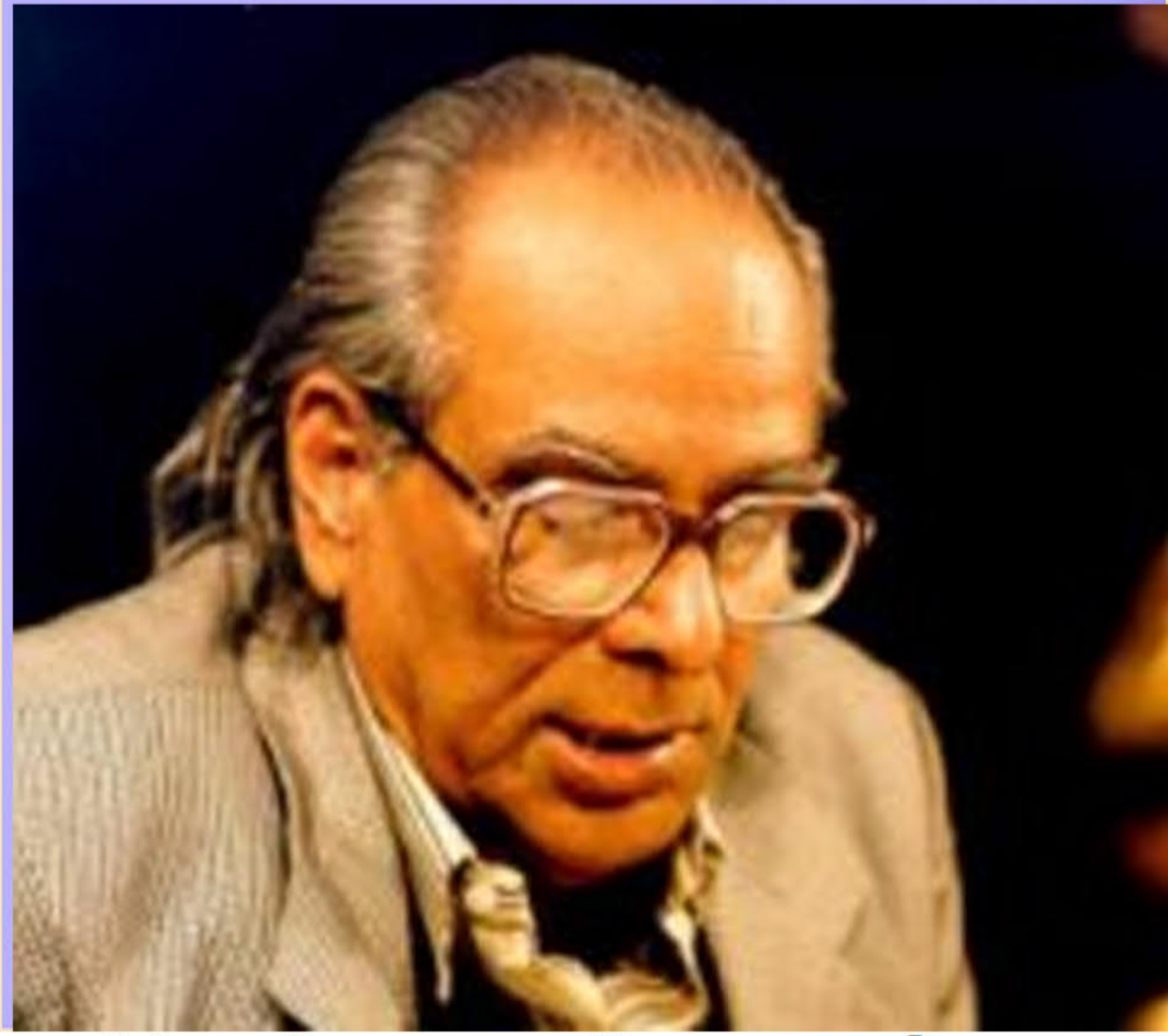
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই নভেম্বর,(২২ শে কার্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। (কিন্তু সার্টিফিকেট অনুসারে জন্ম তারিখ - ১লা মার্চ,১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। এটি সঠিক ছিল না। তাঁর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) তাঁর পিতা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়াগাছা জমিদারের অধীনে কাজ করতেন। মাতার নাম লাবণ্যপ্রভা দেবী। [১][২] [৩] তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে গ্রামের বাড়িতে যৌথ পরিবারে। স্কুলের পড়াশোনা সোনারগাঁও এর পানাম স্কুলে। কিন্তু দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে তাঁরা চলে আসেন ভারতে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বানজেটিয়া গ্রামে গড়ে ওঠা মণীন্দ্র কলোনিতে পিতার বাড়িতে কিছুকাল থিতু হয়ে থাকেন। এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। তারপর যাযাবরের ন্যায় কেটেছে তাঁর যৌবন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.কম.পাশ করেন ও পরে বি.টি. পাশ করেন। বি.টি.পড়ার সময়ই আলাপ হয় সহপাঠী 'মমতা'র সাথে। পরে তাকে বিবাহ করেন।

এরপর কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন। কখনো নাবিকরূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, আবার কখনো বা ট্রাক-ক্লিনারের কাজ লেগে পড়া। পরে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অল্প কিছু দিন মুর্শিদাবাদ জেলার চৌরীগাছা স্টেশন নিকটস্থ সাটুই সিনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিন-চার বৎসর সাটুইয়ে থাকার পর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকাপাকি ভাবে চলে আসেন কলকাতায়। কখনো হলেন কারখানার ম্যানেজার, কখনো বা প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা। পরে অমিতাভ চৌধুরীর আহ্বানে যোগ দেন কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে এবং সেখান থেকেই কর্মে অবসর নেন।

বিভিন্ন পেশার মধ্যে থেকেও লেখালেখি করে গেছেন তিনি। তবে কলেজে পড়ার সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে যায়। আর পেশার তাগিদে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর প্রথম গল্প ওয়েলসের বন্দর শহর নিয়ে লেখা 'কার্ডিফের রাজপথ' প্রকাশিত হয় বহরমপুরের "অবসর" পত্রিকায়। তাঁর এর পরের গল্প ছিল 'বাদশা মিঞা'। বহরমপুরের কলেজের বন্ধুদের আগ্রহে'উল্টোরথ'পত্রিকায় উপন্যাস প্রতিযোগিতায় জাহাজের জীবন নিয়ে প্রথম উপন্যাস "সমুদ্র মানুষ" লিখেই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'মানিক-স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন তিনি। এরপর তিনি তাঁর অর্থসঙ্কট মেটাতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখে গেছেন বহু উপন্যাস। ছোট-কিশোর ও বড়দের সবার জন্যই তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসটি হল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। এটি মূলতঃ চারটি সিরিজে বিন্যস্ত। প্রথম পর্ব 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে,দ্বিতীয় পর্ব 'মানুষের ঘরবাড়ি',তৃতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান' এবং চতুর্থ পর্ব হল 'ঈশ্বরের বাগান'। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষের জীবন,তাদের সংগ্রামী বিষয় এবং পটভূমিসহ জীবনের রোমাঞ্চকর অভিযানের লৌকিক অলৌকিক উপলব্ধি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর এই রচনা কেবল বাংলা সাহিত্যকে নয়,ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে ক্লাসিক পর্যায়ে বারোটি মূল ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে গ্রাম বাংলার জীবনও অনেক বেশি করে ধরা দিয়েছে। তাই তাঁর মধ্যে অনেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার খুঁজে পান।